সম্পাদকীয়

প্রকৃতির নিয়মে বছর আসে, বছর যায়। এই চলমানতাই ভগবানের সৃষ্ট জগতকে রেখেছে প্রাণময় ও বৈচিত্র্যময় করে। কবিগুরু বলেন—গতিই প্রাণ, গতিই সত্য। যেখানে এই গতি রুদ্ধ, সেখানেই মৃত্যু, সেখানেই জড়তা। মানুষের জীবনে এবং সংসারীর জীবনে গতিবিহীনতা অসত্য, অর্থহীন। আবার এই গতির অভিযান সম্পূর্ণ তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। আপাত দৃষ্টিতে সব সময় কবিগুরুর উপলব্ধ এই সত্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অন্যথা হয় না, হতে পারে না।

যদিও প্রকৃতির নিয়মে কাল সর্বদাই গতিময়, কিন্তু এক এক সময় এই গতিময় কালকেই আমরা যেন গতিহীন স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখি। এই রকমই হঠাৎ স্তব্ধ ও অচঞ্চল হতে দেখেছি আমরা গত ১৯৬২ খৃষ্টাব্দকে। —এক দিকে কিউবা সঙ্কট, অপর দিকে ভারতে চীনা আক্রমণ। বিশ্ব এবং ভারত এই দুইয়েরই নাগরিক হিসেবে এই ঘটনা আমাদের করে দিয়েছে নির্বাক, স্পন্দনহীন। যাই হোক, ভালয় ভালয় মিটে গেল কিউবা সঙ্কট। কিন্তু যে ঘটনা আসমুদ্র হিমাচলের আপামর জনসাধারণকে সকলপ্রকার ভেদাভেদ ভুলিয়ে করে দিয়েছে এক জাতি, এক প্রাণ—তাহল বিশ্বাসঘাতক চীনের বর্বরোচিত, সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত ভাবে ভারতবর্ষের পুণ্যভূমি আক্রমণ।

লোহাকে নেহাইয়ে পেটাতে হয় আগুনে পুড়িয়ে। ঝরে পড়ে তার গা থেকে সকল প্রকার আবর্জনা। এই ভাবে মুক্তিলাভ করে খাঁটি লৌহখণ্ডটি। ঠিক এই রকম ভাবেই কি ব্যক্তিজীবনে, কি রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রয়োজন আছে আঘাতের। এই আঘাতের প্রয়োজন আছে বলেই প্রকৃতির নিয়মে এই আঘাতের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। আপাত দৃষ্টিতে এটা যতই দুঃসহ ও পীড়াদায়ক হোক না কেন, কিন্তু এর প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের পক্ষে চীনা আক্রমণ এক বিরাট আঘাত সন্দেহ নেই। কেননা ভারত কখনও বিশ্বাসভঙ্গের কথা চিন্তাই করতে পারে না, অতীতেও কখনও করেনি। ভারতের যে মর্মবাণী সেই সুদূর অতীতকাল থেকে ধ্বনিত হয়ে এসেছে তা হল বিশ্বাস, প্রেম প্রীতি, ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি। চীনকে আমরা ভালোবেসেছিলুম অন্তর দিয়ে, গ্রহণ করেছিলুম তাকে একান্ত আপনার বন্ধু বলে, চেষ্টা করেছিলুম জগতে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, স্বীকৃতি দিতে। কিন্তু সেই চীনই আক্রমণ করে বসল ভারতবর্ষকে। প্রথমটা যদিও আমরা বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু

তারপরই ভারতের সুপ্ত অন্তরাত্মা উঠল জেগে, তার সুপ্ত শক্তি নিয়ে। বৈষ্ণব রূপ পরিগ্রহ করল শাক্তের। ভুলে গেল কোটি কোটি ভারতবাসী তাদের জাতিগত, ধর্মগত ও কর্মগত ভেদাভেদ। গেয়ে উঠল সকলে ঃ

"একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

যে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতাগণ নানাভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন, এক মুহূর্তেই তার সমাধান হয়ে গেল। আজ সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের একটি মাত্র পণ ও চিন্তা—আর তা হল তাদের জন্মভূমি ও মাতৃভূমি ভারতকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা এবং তা যে কোন কিছুর বিনিময়েই হোক। কেননা ভারতের বাণী হল ঃ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। সকলপ্রকার দুঃখ ও আঘাত সহ্য করতেও আজ আমরা প্রস্তুত এবং তা স্বতস্ফূর্ত ভাবেই, কোন রাষ্ট্রনেতার অনুরোধে বা আদেশে নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় ভারতের এই জাতীয় সংহতিকে নষ্ট করবার জন্য আত্মনিয়োগকারী সেই রাজনৈতিক দল ও তার বিবেকহীন ও বুদ্ধিহীন সমর্থনকারীদের কথা। যাদের কাছে নিজের মায়ের অপেক্ষা অপরের মায়ের মূল্য অধিক। যারা নিজের দেশমাতৃকাকে অবহেলা করে পরের দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রয়োজন আছে বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের। কিন্তু দলীয় স্বার্থ যখন দেশের স্বার্থকে অতিক্রম করে বসে, তখন সেই দল হয়ে পড়ে দেশের পক্ষে বিপজ্জনক।

ভারতে এরূপ দল এবং দলের সমর্থনকারী যারা তাদের বিরুদ্ধে ফেটে পড়ুক ভারতীয় জনসাধারণের তীব্র ক্ষোভ, ঝরে পড়ুক সীমাহীন ঘৃণা। লুপ্ত হোক এরূপ দল ও দলের দমর্থনকারীদের অস্তিত্ব চিরতরে ভারতের মাটি থেকে।

কিন্তু প্রথমেই যে কথা বলেছি যে কবিগুরু গতির মধ্যে সম্পূর্ণতাকে লাভ করবার যে সত্য উপলব্ধি করেছেন, তা অনেক সময়ে এই সকল ঘটনাই আবার আপাত দৃষ্টিতে সন্দেহের সৃষ্টি করে। মনীষীরা বহু দিন ধরে আশা করে এসেছেন—শান্তিময়, প্রীতিময় ও আনন্দময় জগতের, যেখানে থাকবে না হিংসা, থাকবে না স্বার্থপরতা, দ্বেষ ও লোলুপতা, বাস করবে সকলে একই দেশের প্রতিবেশীরূপে—সেই আশাকে একান্ত ভাবেই বিলীন করে দেয় চীনের ভারত আক্রমণের ঘটনা। কিন্তু তবু আশা করব যে, কবিগুরু ও মনীষীদের আশা ও উপলব্ধ সত্য কখনও মিথ্যা হয় না, হতে পারে না। সত্যিই এমন একদিন আসবে, যেদিন চীনের মত বিশ্বাসঘাতকেরা তাদের বিশ্বাসঘাতকতা যাবে ভুলে। এবং শান্তিময়, প্রীতিময় ও আনন্দময়

জগৎ সৃষ্টির কার্যে আত্মনিয়োগ করবে একনিষ্ঠ ভাবে। ভগবান এই সুমতি দিন এদের।

এই বছরটি অর্থাৎ ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যোগ্যতম উত্তরসাধক এবং ভারতের আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। ভারতমাতার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। বর্তমান যুগ হল নৈরাশ্যে ভরা। হতাশা, বেদনা আর সংশয়ে যখন সকলের মন দোলায়িত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথ অনুসরণের দ্বারা এই অন্ধকার আচ্ছন্ন, সঙ্কটাকুল ও অনিশ্চিত অবস্থা আমরা অতিক্রম করতে পারি অতি সহজে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে আমরা দেখি আধ্যাত্মিকতা ও সুখদুঃখময় জীবনের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও একাত্মকতা। সাংসারিক জীবনকে তাঁর মত গুরুত্বপূর্ণ করে সম্ভবতঃ আর কোন মণীষী দেখেননি। তাঁর বাণী যেমন স্বচ্ছ, সহজ ও সরল তেমনি অনুসরণযোগ্য—যা অপরাপর মণীষীদের বাণীতে সচরাচর দেখা যায় না। এই মহাপুরুষের পুণ্যজন্মশতবার্ষিকীতে আমরা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি।

গত বছর জুলাই মাসে আমরা প্রায় একই সঙ্গে হারিয়েছে দুই 'ভারতরত্নকে'। এদের মধ্যে এক রত্ন হলেন পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন এবং অপরজন আমাদের পশ্চিম বাংলার বড় প্রিয় এবং পরম গৌরবের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ডাঃ রায় আমাদের নব্য বাংলার স্রষ্টা। সমগ্র জীবন তিনি দেশ ও দশের কাজে নিজেকে করেছিলেন উৎসর্গ। সমগ্র প্রাণমন তিনি সঁপে দিয়েছিলেন নব্য বাংলার গঠনে। নব্য বাংলার সর্বত্রই তাঁর স্মৃতি রয়েছে ছড়িয়ে। এই কর্মযোগীর মৃত্যুতে বাংলার যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। উপর্যুক্ত দুজন ব্যতীত অপর এক 'ভারতরত্ন' ডঃ বিশ্বেশ্বর রায়ও লোকান্তরিত হয়েছেন। সর্ব্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করি এই তিন কর্মযোগীর চিরশান্তি।

পশ্চিমবাংলা আরও হারিয়েছে তার জনপ্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায় এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবনরতন ধর মহাশয়দ্বয়কে। এদের আত্মারও চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও সম্পাদক সজনীকান্ত দাস ও নাট্য সমালোচক ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ত্রয়ের মৃত্যুতে বাংলা হারাল তিনজন প্রতিভাবান পুরুষকে। এ ক্ষতি সত্যই অপূরণীয়।

এছাড়াও আমরা আর যে সকল প্রতিভাবান পুরুষদের হারিয়েছি তাঁদের মধ্যে আছেন বর্তমান বাংলার চলচ্চিত্র ও মঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও শ্রেষ্ঠ নট ছবি বিশ্বাস, কৌতুকাভিনেতা

তুলসী চক্রবর্ত্তী ও নবদ্বীপ হালদার এবং প্রখ্যাত কীর্ত্তনীয়া অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। এঁদের মৃত্যুতে বাংলার চলচ্চিত্র, নাট্য ও সঙ্গীতজগতের এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল। এঁদের আমরা চিরশান্তি কামনা করি।

বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত লাভ করেছেন 'সাহিত্য একাডেমী' পুরস্কার। রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবনমোহিনী পদক এবং লীলা পুরস্কার লাভ করেছেন যথাক্রমে শ্রীমতী আশাপূর্ণাদেবী এবং পুষ্পদেবী। 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পুরস্কার লাভ করেছেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন। দিল্লী বিশ্বলিদ্যালয় থেকে 'নরসিংহদাস' পুরস্কার লাভ করেছেন ইন্দ্রমিত্র এবং শ্রীহরিহর প্রসাদ সাহা। এ বছরের 'ভুবনেশ্বরী' পদক লাভ করেছেন যথাক্রমে প্রসিদ্ধ রসসাহিত্যিক শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—এঁদের সকলকেই জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রার্থনা করি সুদীর্ঘ জীবন।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল, প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাসের বাংলা সাহিত্য গবেষণায় ডি, লিট্ উপাধি লাভ এবং বাংলা তথা ভারতের গৌরব ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রাষ্ট্রীয় উপাধি 'পদ্মবিভূষণ' লাভ। শ্রীদাসই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্য গবেষণায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, লিট্ উপাধি লাভ করলেন। আর ডঃ চট্টোপাধ্যায়কে উপর্যুক্ত সম্মানে ভূষিত করে রাষ্ট্রীয় সরকার যথার্থ গুণীকেই যে মর্য্যাদা দান করেছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এবছরের বাংলা দেশের যে দুজন 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন তাঁরা হলেন নটসূর্য্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এবং পিকিংএ ভারতের ভারপ্রাপ্ত দূত ডক্টর পি, কে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। আর 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন কলকাতার রোটারিয়ান শ্রীনীতিশচন্দ্র লাহিড়ী। এঁদের সকলের সম্মানলাভে আমরা সকলেই গর্ব্বিত।

পরিশেষে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করি বর্তমান ভারতের সর্বজনবরেণ্য দার্শনিক রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধেয় ডঃ সর্ব্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনকে। এই জ্ঞান তপস্বীকে রাষ্ট্রপতিরূপে লাভ করে আমরা সত্যই ধন্য। ভারতের সর্বোচ্চ সম্মানের পদে উপযুক্ত মনীষীই যে ভূষিত হয়েছেন, তাতে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এই দার্শনিক মহাপুরুষের সুস্থ ও আনন্দময় দীর্ঘজীবন।

সম্পাদকীয়

কলেজ পত্রিকা এবছর পদার্পণ করল সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি, কতদূর সফলকাম হয়েছি তা জানি না। সে বিচার ভার ছাত্র-ভায়েদের ওপর। তবে যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে তবে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমি।

এবছরে লেখার সংখ্যাগত পরিমাণ বেশ অনেকই হয়েছিল। কিন্তু স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অনেক লেখাই চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। লেখক বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করব এর জন্য হতাশা না হওয়ার। কারণ সকলক্ষেত্রে লেখা গুণগত বিচারেই যে অমনোনীত হয়েছে তা নয়, পরিমিত স্থানও এর জন্য দায়ী। এবারের লেখার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হল যে বর্তমান ভারতের সঙ্কটে ছাত্রদের মনও যে কত বিচলিত, তার ছাপ পড়েছে একাধিক রচনায়। সমসাময়িক ঘটনা যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, এটা সাহিত্যেরই একটা চিরন্তন ধর্ম।

এবছর পত্রিকা প্রকাশের সময় বিশেষ করে একজনের অনুপস্থিতির অভাব বোধ করেছি। তিনি আমাদের বাংলা বিভাগের জনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীগোপিকানাথ রায়চৌধুরী মহাশয়। বিশ্বভারতীর অধ্যাপনা কার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি। এঁর গৌরবময় ভবিষ্যৎ প্রার্থনা করি। পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে যাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করে ধন্য হয়েছি তাঁরা হলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেন, উপাধ্যক্ষ নীরদকুমার ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক সত্যরঞ্জন বসু, অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ, অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সলিল গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্মাল্য আচার্য, শ্রীপরেশচন্দ্র দাস (প্রাক্তন ছাত্র) ও কমার্সিয়াল প্রেসের কর্ম্মীবৃন্দ। এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ছাত্রবন্ধুগণের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীঅসীমকুমার বসুকে ধন্যবাদ জানাই পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য।

শ্রীবরুণকুমার চক্রবর্ত্তী।

বালির কণা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বালির কণাটা দেখেছ,
শহরের কোন নালার ধারে
চিক্‌চিক্ করছে শরতের রোদে ?

কি দেখব বালির কণা !
আমার আকাশ ছোঁয়া শহরের মিনার,
বাঁধানো রাস্তা সাজানো বাগান স্বচ্ছ সায়র
আমার দিগ্বিজয়ী দম্ভ, শোভা আর সমারোহ।
তুচ্ছ বালির কণা কি চোখে পড়ে ?
কিন্তু ওই বালির কণাটিতে
মহাকাশের কৌতুকের হাসিই যে চমকায়
ওই ত বিলুপ্তির বীজাণু
এসেছে কত ইতিহাস মুছতে মুছতে
ওর পেছনে বিস্মৃতির কি অনিবার্য ঢেউ !

এক থেকে অগণন হয়ে
পুঞ্জ পুঞ্জ সুষুপ্তির অন্ধকারে
একদিন আমার এ শহরও তলিয়ে দিতে পারে।
তখন কি থাকব শুধু
প্রত্ন পণ্ডিতদের খনিত্রের আশায় ?

তার চেয়ে
এই শহরের সমস্ত হাসি সমস্ত কান্না ফুটিয়ে
একটি আশ্চর্য রূপকথা যদি বানাতে পারতাম
যা কুহেলী জালের মত
বিছিয়ে থাকবে নীল শূন্যে,
আমাদের সমস্ত খোঁজা, যোঝা ও বোঝার
যন্ত্রণা ও উল্লাস
ভাবীকালের কোনো শুক্তি কোষে
স্বাতী তারার শিশিরের মত ঝরিয়ে দেবার জন্যে !

সাধক রামপ্রসাদ ও তাঁর পদাবলী ॥

অমিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় ঋষিরা বলেছেন 'কবির্মনীষী'—কবিই জ্ঞানী। যিনি সিদ্ধ, তিনিই জ্ঞানী, তিনিই কবি। রামপ্রসাদ তন্ত্রোক্ত বীরাচারী সাধক; সাধন-বলে তিনি সিদ্ধ হয়েছেন, ধ্যান-যোগে তিনি লাভ করেছেন ব্রহ্মজ্ঞান। তাঁর পদাবলী এই আধ্যাত্মসাধনারই অঙ্গ, ধ্যানযোগের ছন্দ।

রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন, "কুলকুণ্ডলিনী"[১] শক্তির পদে আমি আমার প্রাণ সঁপেছি।" এই কুলকুণ্ডলিনী কি? তন্ত্রমতে সর্বব্যাপিণী শক্তি যা বিশ্বের অণুপরমাণুর ভিতরেও সুপ্ত; এবং প্রত্যেক মানুষের মূলাধারে এ বিশ্বশক্তি সংগৃহীত। তন্ত্রের আধ্যাত্মকৌশল এই শক্তিকেই জাগ্রত করা। স্বামী বিবেকানন্দও তাই চেয়েছিলেন মানুষের এই অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধন। সাধক রামপ্রসাদ এই লীলাচঞ্চল বিশ্বের মূলীভূত শক্তিকেই মাতৃরূপে আরাধনা করেছিলেন। এবং তাঁর অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মদৃষ্টি দ্বারা অনুভব করেছিলেন সকলের মধ্যেই বিশ্বজননীর বিকাশ—"ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।" গ্রহতারাময় অনন্ত গগনে, সূর্য-চন্দ্র গ্রহ-তারার বিবিধ গতির মধ্যে—নিখিল জগতের ঋতু লীলার বৈচিত্র্য সৃষ্টি ও রূপের ক্রমবিকাশের অপরূপ প্রকাশে তিনি আছেন সর্বব্রহ্মময় জগৎরূপে। Sister Nivedita তাঁর 'Two saints of Kali' প্রবন্ধে রামপ্রসাদ প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ কবি William Blake-এর উল্লেখ করেছেন; এ দিক দিয়ে তা যথাযথ হয়েছে। স্থূল বস্তুবাদ অস্বীকার করে Blake তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও অধ্যাত্মদৃষ্টি আশ্রয় করে কাব্য লিখেছেন। Blake এর কাব্যে আমরা দেখি, পৃথিবীর সমুদয় প্রাণীর মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ ও পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। এ দিক দিয়ে রামপ্রসাদের সাথে তাঁর মিল অবশ্যই আছে।

তন্ত্র অনুসারে সাধন উপায়ের বিচিত্র স্তর ও ক্রম রামপ্রসাদের পদাবলীতে দেখা যায়। তাঁর এই মাতৃকাসাধনের মধ্যে বাঙালীর ঐতিহ্যইঙ্গিত অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। তবে তাঁর শক্তিরূপিণী দেবীর রূপ ও প্রকৃতির মধ্যে গতানুগতিক চণ্ডী, অন্নদা বা কালিকার স্পর্শ কিছু নেই। এই শ্যামা মা মানুষকে বিপর্যয়ের চক্রে পেষণ করে পূজা আদায় করেন না। বীভৎস হলেও তিনি মধুর; তিনি প্রলয়ঙ্করী, ধ্বংসলীলায় উন্মত্তা, তবু করুণাময়ী কালভয়হারিণী মা। সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্রী তিনি;—

"ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো॥"

এই শক্তি সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে রামপ্রসাদ নানা স্তর অতিক্রম করেছেন। সামীপ্য,[২] সালোক্য[৩] স্তর অতিক্রম করে অবশেষে তিনি সার্ষ্টিমুক্তির[৪] প্রয়াসী হন। তিনি সিদ্ধ পুরুষ, তাই বলেন, 'আমি সিদ্ধ-সেবায় বদ্ধ আছি।' বেদান্ত-বর্ণিত অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় জ্ঞানময় জীবনের স্তর অতিক্রম করে তিনি আনন্দময় জীবনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। এই আত্মিক সাধনার পথে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে সিদ্ধি হয় না, এর জন্য চাই একাগ্রতা। স্বাভাবিক চিত্তবৈকল্য হেতু কবি একদিন শ্যামামার কাছে ধনসম্পদ না পাওয়ার জন্য অনুযোগ করেছিলেন। ক্রমে সাধনার উচ্চতর স্তরে এসে তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য ত্যাগ করে এক প্রশান্ত অনুভূতি লাভ করলেন; এবং ধনসম্পদের অসারতা উপলব্ধি করতে পারলেন। 'সামান্য ধন' তখন তাঁকে কিছুমাত্র প্রলোভিত করতে পারে নি, 'টাকা মাটী, মাটী টাকা' এই বোধটি তখন তাঁর মনে জেগে উঠেছে। মূল কথা যে সাধনশক্তি আয়ত্ত হলে সাধক লয়মুক্তি লাভ করতে পারেন, রামপ্রসাদ তাঁর অধিকারী হয়েছিলেন। দেহস্থ ষটচক্রে[৫] তিনি জগজ্জননীকে আপন করে পেয়ে তৃপ্ত হতে চেয়েছেন; বিলীন হতে চেয়েছেন অনন্ত শক্তিতে।—

"এবার কালী তোমায় খাব,
খাব খাব গো দীন দয়াময়ি।
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার॥
গণ্ডযোগে নামিলে সে হয় যে মা—খেকো ছেলে।
তুমি খাও কি আমি খাই মা দুটার একটা করে যাব।"

অন্যান্য পদকর্তারা কিন্তু মাতৃসাধনার এই স্তরে পৌছতে পারেন নি। সাধক কমলাকান্ত মধুমত্ত ভ্রমরের মত মায়ের চরণ-সরোজ-মধু পান করেই তৃপ্ত হয়েছেন। 'মা খেকো' ছেলে হবার স্পর্ধা তাঁর হয়নি। এই সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠবার জন্য রামপ্রসাদ তীব্র ব্যাকুল হয়েছিলেন। কারণ ব্যাকুল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। 'একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত।'—এই সব গানে কবির প্রাণের অন্তঃস্থল থেকে ব্যাকুল ভক্তি উৎসারিত হয়ে অপরূপ সরলতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। এই সুতীব্র ব্যাকুলতাই তাঁর পদাবলীকে হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছে।

সাধন ক্রমের সুউচ্চ স্তরে উঠে রামপ্রসাদ কিন্তু সংসারত্যাগী গুহাবাসী হবার পক্ষপাতি ছিলেন না। সংসারে ঈশ্বর ভুলে আত্মপূজা, সন্ন্যাসে সংসার ভুলে ঈশ্বর পূজা, যিনি ও দু'য়ের সামঞ্জস্য করে চলতে পারেন তিনিই মনু ও গীতোক্ত সন্ন্যাসী। অন্তরে বাইরে ইন্দ্রিয় জয় করে

যিনি বিষয় ভোগ করেন তিনিই আসক্তিশূন্য, তিনিই কর্মযোগী। রামপ্রসাদের জীবনে এই দৃষ্টান্ত, তাঁর সঙ্গীত মধ্যেও এই ধর্মের উপদেশ। কবি হিসেবে তিনি জীবন প্রেমিক, গৃহী; আর সাধক হিসেবে তিনি ত্যাগী, উদাসীন। তিনি ভোগী অথচ যোগী। তান্ত্রিক সাধনার এই বিচিত্র সমন্বয়ের মর্মবাণীই তাঁর কবিতার মর্মবাণী। এ কারণে তাঁর পদাবলী কি বিরাগী, কি বিষয়ী সকলেরই মনোজ্ঞ।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসরণে শক্তি সাধনা করেছেন, কিন্তু কোনো ধর্মের প্রতিই তাঁর বিদ্বেষ ছিল না। কুলচূড়ামণিতে তান্ত্রিকের আচার সম্পর্কে বলা হয়েছে "উদার চরিত্র সর্বত্র বৈষ্ণবাচার তৎপরঃ"—অর্থাৎ তান্ত্রিক উদার চরিত্র ও বৈষ্ণবাচার সম্পন্ন হবেন বৈষ্ণববিদ্বেষ বশে নয়, উদারতাবশেই রামপ্রসাদ কালীর কালাভাব কীর্ত্তন করেছেন। পরবর্তীকালে শাক্ত কবি কমলাকান্ত এই সুরে সুর মিলিয়েছেন। তা ছাড়া এই সমন্বয় সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন রামপ্রসাদেরই উত্তর সাধক। রামপ্রসাদ ছিলেন সমদর্শী। যিনি যে ভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করুন না কেন, এবং যে নামেই ডাকুন না কেন, সকলের গম্যস্থান একই; এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর পদাবলী সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট হয়নি। ধর্মসমন্বয়ের এক মহান আভাস তাঁর গানে সুস্পষ্ট;—

"মন করোনা দ্বেষা দ্বেষি
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠ বাসী ॥
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তালাসি
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম – সকল আমার এলোকেশী।"

সকল ধর্মের প্রতিই এই ঔদার্য্য প্রকাশের ফলে প্রসাদী পদাবলী মহিমার্ণব হয়ে উঠেছে। অপরাপর পদকর্ত্তাগণ কিন্তু তাঁদের কাব্যে এই মহত্ব দেখাতে পারেন নি। রামপ্রসাদের গানে উদার আধ্যাত্মিকতার আরও পরিচয় পাই। তিনি জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা করার বিরোধী ছিলেন। পূজায় ঝাড় লণ্ঠনের রোসনাইয়ের কি প্রয়োজন? এই আড়ম্বরের ফলেই তো অন্তরে অহংকারের উদয় হয়। ঐ অহংকার ভক্তিপথের অন্তরায়। কিন্তু পূজায় প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন এই অকৃত্রিম ভক্তির। তাই তাঁর মতে ভক্তির সঙ্গে জাঁকজমক বিহীন পূজাই যথার্থ পূজা;—

"মন তোর এত ভাবনা কেনে!
একবার কালী বলে বস্‌রে ধ্যানে ॥
জাঁকজমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তার করবে পূজা, জানবে নারে জগজ্জনে ॥"

রামপ্রসাদ যদিও বিগ্রহ পূজা করতেন, তথাপি তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছে 'মা বেটি কি মাটির মেয়ে!' তাঁর অন্তরে বার বার জেগে উঠেছে সেই অনন্ত বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরীর কথা। বিশ্বের সকল সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে তিনি তাঁর আরাধ্যা দেবীমূর্ত্তিকে খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই "ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি" গঠনের অসারতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তীর্থভ্রমণও তাঁর কাছে নিষ্প্রয়োজন। তাঁর শ্যামা তো সর্বব্যাপিনী। অন্তরে যথার্থ ভক্তি ও নিষ্ঠা থাকলে আপন গৃহেই তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। কথিত আছে, একবার কাশীযাত্রাকালে গঙ্গাবক্ষে রামপ্রসাদের মনে অনুভূতি জাগে। তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে গেয়ে ওঠেন—"রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি পাবে কাশী দিবনিশি।"

অন্যান্য পদকর্ত্তাদের মধ্যে কেউবা মুখ্যতঃ কবি, কেউবা সাধক। কিন্তু রামপ্রসাদের পদাবলীতে সাধকত্ব ও কবিত্বশক্তির এক অপূর্ব গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম ঘটেছে। মানুষের গভীরতর ধ্যান ও কল্পনা এখানে গানের সুরে ও ছন্দে ব্যক্ত। এখানেই তাঁর পদাবলীর সাধারণত্ব তাই প্রসাদী পদাবলীকে সাহিত্যের কোনো নির্দ্দিষ্ট বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না; মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অপৌরুষেয়বেদবাণীর ন্যায় এ এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু।

১। তন্ত্রমতের প্রাণশক্তি।

২। ঈশ্বরের সান্নিধ্য।

৩। ঈশ্বরের সহিত একলোকে বাস।

৪। ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য।

৫। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা।

বিবেকানন্দ-প্রশস্তি

শ্রীমানবেন্দ্রনাথ সান্যাল

শত বরষের আবাহনে তব মর্ত্ত্যে পদার্পণ,
শত বরষের সাধনার তুমি চিরইপ্সিত ধন
বাংলার ধ্বজা - বাঙালীর শির
পরপদানত জড়বৎ স্থির
সহসা আসিলে ঘুচাতে জড়তা
মুখে দিলে নব ভাষা—
ডান হাতে তব কর্ম্মের ডালা
বাম হাতে নব ভক্তিরমালা ;
বন্যার বেগে আসিলে যে তুমি
সঞ্চারি' নব আশা।

আঁধার তোমার নয়নের বিষ
জড়তা ও অপমান
দুর্ব্বার বেগে গেয়েছিলে শুধু
আলোকের জয়গান।
পরমহংসে পরম ভক্তি—
দিয়েছিল বুঝি অঢেল শক্তি
তথাপি তুমি'ত করনি গর্ব্ব
বল নাই বড় বুলি—
মিথ্যার স্থলে সত্যের বাণী
নিজের শৌর্য্যে বীরত্বে আনি
তুমি অবতার, তুমি শূলপাণি,
হীনমনা সব শয়তানদের
মুখোশ দিয়েছ খুলি।

'চিকাগো'র সেই ধর্ম্মসভায়
তোমার সিংহনাদ
যশের মুকুট আনিল ছিনায়ে
পশ্চিম উন্মাদ।

সত্যালোকিত কে এই বীর,
শত বিপদেও উন্নত শির —
জবাবে সেদিন ফুলায়ে বক্ষ
বাঙালী আগায়ে আসি,
শুনাল জগতে বিবেকানন্দ
আমাদেরই প্রতিবেশী ঃ
বহুযুগব্যাপী আমাদের ধ্যান
মূঢ়তার দেশে জ্বলন্ত জ্ঞান
বিবেকানন্দে মর্ত্ত্যে এনেছে
অধরে ফুটাতে হাসি।

ক্লৈব্যের দেশে অমিত-বীর্য্য
তুমি বৈদিক ঋষি
তোমার অভাবে কাঁদিছে বাঙালী
কাঁদিছে বিশ্ববাসী।
কালের সিন্ধু করি মন্থন
মহা-হলাহল ওঠে অনুক্ষণ
এ হলাহলে দেবতা-দৈত্য
দুই-ই হবে নিঃশেষ,
একদিকে রহে অমেয় বিত্ত
এক দিকে শুধু অভাব নিত্য
জুড়োতো মোদের দগ্ধ চিত্ত
এসে ধর রণবেশ—
দুঃখের দেশে শান্তির বারি
নিজ হাতে তুমি সিঞ্চন করি,
হৃদয়ে জ্বালাও আশার আলোক ঃ
সুখী হোক জনগণ ;
হিংসার দেশে আনিতে মৈত্রী
হোক্ তব আগমন।

॥ দেশাত্মবোধক গান ॥

অসীম ঠাকুর

নওজোয়ান নওজোয়ান নওজোয়ান
দীপ্ত উদার কণ্ঠে ধ্বনিছে
মহাজীবনের গান।
পূব প্রান্তরে রক্তিম ঐ সূর্য
উত্তরে বাজে নির্ভয় জয়-তূর্য—
তোরা, চেংগীস খাঁর বংশধরের
সংহার কর প্রাণ।

মহাভারতের ভারতে আবার
এসেছে দুর্যোধন
কতশত ভীম রয়েছে এখনো
রে মূঢ় দুঃশাসন ;
সঞ্জয় তোর সব লয় করা রক্ত
আছে আছে জানি বাহু সুকঠিন শক্ত
শিবদেব আজ রুদ্র হয়েছে
শুনি ভৈরবী তান।

কালজ্ঞাপক পদ ও তাহার সমাধান প্রণালী

শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের লেখকগণ তাঁহাদের গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন এক বিচিত্র আঙ্গিকে। কাব্য মধ্যে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকেই কবিরা তাঁহাদের গ্রন্থ রচনার কাল প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন,

শাকে সিমে জড় হৈলে যত শক হয়।
চারি বাণ তিন যুগে বেদে যত রয়॥
রসের উপরে রস তায় রস দেহ।
এই শক গীত হৈল লেখা কর্যা লেহ॥

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, ইহাতে ১ হইতে ৯এর মধ্যবর্তী তো একটি সংখ্যাও দেখা যাইতেছে না; তাহা হইলে রচনাকাল বুঝা যাইবে কিরূপে? রচনার সন তারিখ এই শ্লোকের মধ্যেই গুপ্ত রহিয়াছে। কবিরা এগুলিকে কিঞ্চিৎ হেঁয়ালী বা প্রহেলিকার ঢঙে রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রহেলিকা সমাধানের কৌশল জানা থাকিলে সন তারিখ সহজেই আবিষ্কার করা যাইবে।

আমরা বর্তমানে কিছু সংখ্যক পদ উদ্ধৃত করিয়া তাহার ভিতর হইতে সন-তারিখ বাহির করিবার চেষ্টা করিব।

মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা বিজয় গুপ্ত তাঁহার গ্রন্থ-রচনার কালনির্দেশক পদটি এইরূপে লিখিয়াছেন:

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক। ঋতু=৬, শূন্য=০, বেদ=৪, শশী=১। এবং শক শব্দের অর্থ শকাব্দ। তাহা গণনা করিয়া দাঁড়াইল ৬০৪১ শকাব্দ? না, তাহার ঠিক বিপরীত।—১৪০৬ শকাব্দ। কারণ, 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ।' অর্থাৎ নির্দেশই দেওয়া আছে এই সকল গণনা সর্বদাই বিপরীত দিকে করিতে হইবে।

দ্বিজ মাধব তাঁহার কাব্য মধ্যে গ্রন্থ রচনার কাল সম্পর্কে এই ভাবে নির্দেশ দিয়াছেন:

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গায় সারদা চরিত॥

ইন্দু=১, বিন্দু=০, বাণ=৫, ধাতা=১। অর্থাৎ গ্রন্থের রচনা কাল হইল ১৫০১ শকাব্দ। শকাব্দের সহিত ৭৮ যুক্ত করিকে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ১৫০১ শকাব্দ +৭৮=১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।

বিপ্রদাস কাব্য-রচনার-কাল সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।

সিন্ধু = ৭, ইন্দু = ১, বেদ = ৪, মহী = ১। অর্থাৎ ১৪১৭ শকাব্দ।

মনসামঙ্গলের কবি কালিদাস তাঁহার গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

গ্রহ বিধু ঋতু শশী শকের গণনা।
এই শকে এই কাব্য করিল রচনা॥

গ্রহ = ৯, বিধু = ১, ঋতু = ৬, শশী = ১। অর্থাৎ ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কালিদাসের গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ১৬১৯ শকাব্দে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামজীবন ভট্টাচার্যের কাব্যের রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোকটি এই ঃ

শর কর ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
মনসা-মঙ্গল রামজীবন রচিত॥

শর = ৫, কর = ২, ঋতু = ৬, বিধু = ১। অর্থাৎ ১৬২৫ শকাব্দ।

কবি ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার বিখ্যাত অন্নদা মঙ্গল কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে লিখিয়াছেন ঃ

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

বেদ = ৪, ঋষি = ৭, রসে = ৬, ব্রহ্ম = ১, অর্থাৎ ভারতচন্দ্র ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অন্নদা মঙ্গল কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করেন।

ভবানীশঙ্কর দাসের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল নির্দেশক শ্লোকটি এইরূপ ঃ

ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।
ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে॥

ধাতা = ১, বিন্দু = ০, সাগর = ৭, ইন্দু = ১। অর্থাৎ ১৭০১ শকাব্দ।

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোন কোন মুদ্রিত পুঁথির শেষভাগে কালজ্ঞাপক এই দুইটি পদ দেখিতে পাওয়া যায় ঃ

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

রস = ৯, রস = ৯, বেদ = ৪, শশাঙ্ক = ১। অর্থাৎ ১৪৯৯ শকাব্দ।

ভাগবতের অনুবাদক সনাতন ঘোষাল তাঁহার 'ভাষা ভাগবত' গ্রন্থের চতুর্থ স্কন্ধের রচনাকাল প্রকাশ করিয়াছেন :

বসু চন্দ্র ঋতু শশী শাক পরিমিতে।
নিবসেন পদ্মবন্ধু মিথুন রাশিতে॥

বসু=৮, চন্দ্র=১, ঋতু=৬, শশী=১। অর্থাৎ ১৬১৮ শকাব্দ।

চণ্ডীমঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবি মুক্তারাম সেনের কাব্য মধ্যে গ্রন্থরচনার কালজ্ঞাপক শ্লোকটি এইরূপ :

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥

গ্রহ=৯, ঋতু=৬, কাল=৩, শশী=১। অর্থাৎ ১৩৬৯ শকাব্দ।

উপরি উদ্ধৃত পদগুলির মধ্য হইতে আমরা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০ সব কয়টি সংখ্যাই পাইলাম। প্রাচীন সাহিত্যে এই কালজ্ঞাপক পদে এক একটি সংখ্যা বুঝাইতে একাধিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এখন আমরা ১ বুঝাইতে কেন ইন্দু, ২ বুঝাইতে কর বা পক্ষ, ৩ এ কাল, অগ্নি, ৪ এ যুগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিব।

১ বুঝাইতে প্রাচীন কালজ্ঞাপক পদে চন্দ্র এবং তাহার বিবিধ প্রতিশব্দ শশী, ইন্দু, বিধু, শশাঙ্ক, সমুদ্রকুমার প্রভৃতি শব্দেরই প্রাধান্য। ইহা ছাড়া মহী, ধাতা, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দেরও ব্যবহার হয়। ১ বুঝাইতে এই শব্দগুলি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

২ অর্থে কর, পক্ষ, যুগল পাওয়া যায়। কর শব্দের অর্থ হাত। হাতের সংখ্যা দুই। পক্ষ—দুই পক্ষ, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ। যুগল অর্থ যুগ্ম, জোড়া, দুই।

৩ বলিতে কাল ও অগ্নি শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হইয়াছে। কালের অর্থ ত্রিকাল —ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কাল। অগ্নি তিনপ্রকার—ভৌম, দিব্য ও জাঠর। কাষ্ঠাদি পার্থিব পদার্থ হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে ভৌম; জল, বায়ু হইতে উৎপন্ন বিদ্যুত, উল্কা, বজ্র প্রভৃতিকে দিব্য এবং ভুক্ত, অন্ন, পানাদি, পরিপাককারী উদরস্থ অগ্নিকে জাঠরাগ্নি বলে।

৪ বুঝাইতে বেদ ও যুগ শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদ—চারিখণ্ডে বিভক্ত। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদ। যুগ হইল চারিটি—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি।

৫ নির্দেশ করিতে বায়ু, শর, বাণ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বায়ু অর্থ দেহস্থ

পঞ্চবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। শর বা বাণ হইল এই পাঁচটি—অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল। এইগুলি মদনদেবের অস্ত্র।

৬ সংখ্যাটিকে রস বা ঋতুর দ্বারা বুঝান হইয়াছে। রস ছয় প্রকার—কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল ও মধুর। ঋতুও ছয়টি—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

৭ অর্থে মুনি ঋষি সিন্ধু বা সাগর শব্দ পাওয়া যায়। মুনি বা ঋষি হইল সাত জন—দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি, পরমর্ষি' কাণ্ডর্ষি ও শ্রুতর্ষি। কিংবা মরীচি, অত্রি, অঙ্গীরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সাতটি তারকা সাতটি ঋষি বলিয়া প্রসিদ্ধ। সপ্তসিন্ধু বা সপ্তসমুদ্র হইল—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল।

৮ বুঝাইতে বসু ব্যবহৃত হইয়াছে। আটে অষ্টবসু। ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভব।

৯ অর্থে অঙ্ক, রস, গ্রহ ও ধনু শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। অঙ্ক হইল নয়টি। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট ও নয়। রস নয় প্রকার শৃঙ্গার বা আদিরস বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্তরস। রস ছয় অর্থে ব্যবহারও দেখা গিয়াছে।

গ্রহ—নবগ্রহ। সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। ধনু হইল নবম রাশি।

০ নির্দেশ করিতে গগন বা শূন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে।

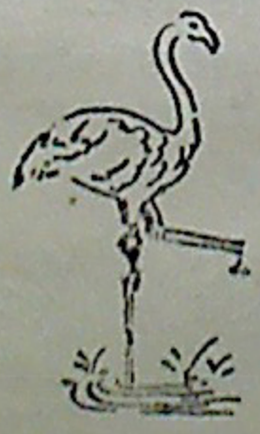

রাজার বাড়ী অনেক দূর..... ॥

বিভাস চৌধুরী

রাজার বাড়ী অনেক দূর পেরিয়ে এলাম শেষে।
ডুবে গেল দিনের সূর্য সন্ধ্যা-নদীর দেশে—
একটি পাখি উড়ে বসে তেপান্তরের মাঠে
কী যেন হায়, হারিয়ে গেল সময়পুরের ঘাটে।

বিষ্টি-ঝরা নিঝুম রাতে ঘুমের সিঁড়ি বেয়ে
আসেনা আর ডাইনীবুড়ী, শঙ্খবরণ মেয়ে ;
কোথায় যেন গহন সাগর, শোলোক-শোনা-মন
কোথায় যেন হারিয়ে গেল ভালবাসার ধন।
রাত কেটে যায় মোমের মতো, অনেক স্মৃতির ভারে
একটি পাখি উড়ে বসে শূন্য মাঠের পারে।

রাজার বাড়ি অনেক দূর পেরিয়ে এলাম শেষে ;
ডুবে গেল দিনের সূর্য সন্ধ্যা-নদীর দেশে।
অবিশ্বাসী হাওয়ায় কাঁপে বেলাশেষের গান
গল্প-বলা মায়ের মুখ সুদূর ব্যবধান।

ঘুমিয়ে আছে একটি রাত শীতের কাঁথা মুড়ে
হাওয়ার ভিতর একটি পাখি হঠাৎ গেল উড়ে।

শাশ্বতী

স্বপনকুমার রায়

তমসা যায় ঘুচে, অরুণ আলোর আভাষে
মেঘের আবরণ ভেদ ক'রে সূর্য উঁকি মারে,
শেষ হয় উদ্বেগ আকুল সমস্ত প্রতীক্ষার।
অসুর নিধন ক'রে রক্তাক্ত হাতে ফেরেন জগন্মাতা।
স্তব্ধতার পালা শেষ হয়, আনন্দ-উল্লাসে
উত্তেজিত হয়ে ওঠে দ্যুলোক-ভূলোক, মঙ্গলশঙ্খ
ওঠে বেজে, লক্ষ কণ্ঠ মুখরিত হয়
দুর্গতিনাশিনী মহামায়ার জয়ধ্বনিতে॥
এ কাহিনী আজকের নয়, এ নয় কাব্যকথার শূন্যধ্বনি ?
যুগ যুগ ধরে এই শাশ্বত সত্য।
অরণ্যের অন্ধকার গুহা থেকে যখনি জেগে উঠেছে—
পশুশক্তি, নিষ্ঠুর, হিংস্র, রক্তলোভী দানব
অসহায় কণ্ঠে যখনি জেগেছে আর্তনাদ,
দানবদলনে তখনি আবির্ভূতা হন দশপ্রহরণধারিণী শক্তিশ্বরী,
তাই আজকে,
ঘোর কুয়াসায় যখন দিক্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন,
শুভবুদ্ধির চেতনা পথ হারিয়েছে দুর্গম অরণ্যপথে
তখন, কান পাতলে এখনও শোনা যায় তাঁর পদধ্বনি,
কণ্ঠস্বরে উদ্বেলিত হয় তেজোদীপ্ত বরাভয় ঃ
"সম্ভবামি যুগে যুগে।"
আশ্বিনের মেঘ উধাও আকাশ অপার আনন্দে
মুগ্ধ বিহ্বল, শিউলি ঝরা মাটির বুকে জাগে
চঞ্চলতা, অণুতে পরমাণুতে শিহরণ লাগে ঃ
তিনি আসছেন, তিনি আসবেন।

মালিনী নাটকের নায়ক বিচার

বরুণকুমার চক্রবর্তী

সাহিত্যের সৃষ্টি মানুষের জীবনবোধ হইতে। আর এই জীবনবোধ যে সকলের এক হইবে না তাহা তো খুবই স্বাভাবিক। এই কারণেই সাহিত্য সমালোচনায় সমালোচকদিগের মধ্যে মতের পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সমালোচক সাহিত্যের ব্যঞ্জনাকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে, আপন আপন মননশক্তি অনুযায়ী।

'মালিনী' রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক নাটক। নাটকটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও যে পরিমাণে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাঁহাদের চিন্তা করাইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নাটকটি সম্বন্ধে সমালোচক মহলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মতদ্বৈততা লক্ষিত হয় নাটকটির নায়ক লইয়া। বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুতর তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারেনা। কারণ নাটকের প্রকৃত নায়ক কে, তাহা যথার্থরূপে নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে নাটকের নাটকীয়তা, রস, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি উপলব্ধির ক্ষেত্রে অনেকটা বাধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এই বিতর্কমূলক প্রশ্নটি বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

সুপ্রিয় মালিনীকে প্রথম সাক্ষাৎ করিয়াছে মন্দিরপ্রাঙ্গনে যেখানে ক্ষেমংকর, চারুদত্ত, সোমাচার্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ মালিনীর নির্বাসনের কথা আলোচনা করিতেছিলেন, যে মুহূর্তে সুপ্রিয় মালিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্তেই সে তাহার হৃদয় মালিনীর নিকট অর্পণ করিয়া ফেলিয়াছে। সুপ্রিয়ের কল্পনাপ্রবণ মন তাহাকেই ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, যাহা তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করে। মালিনীকে দর্শন করিয়া সুপ্রিয়ের হৃদয় দোলায়িত। সে মালিনীর ধর্মমতকে ভালবাসিতে যাইয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে মানবী মালিনীকে। ইহার পর অতি দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে মালিনী নবধর্মের প্রচারক হইতে সাধারণ মানবীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই দৃশ্যের প্রথম হইতেই দেখা গিয়াছে যে মালিনী কিরূপে সুপ্রিয়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বসিয়াছে। প্রথমেই সে সুপ্রিয়কে বলিয়াছে :

কী শাস্ত্র দেখাব আনি !
তুমি যাহা নাহি জান, আমি কি তা জানি ?

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে মালিনীর এই বিনয়ী বক্তব্যের মধ্যে যে সুপ্রিয়ের প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা যাইবে। সুপ্রিয় যখন মালিনীকে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছে ঃ

জানিবার কিছু নাই, নাহি চাহি জ্ঞান।
সব শাস্ত্র পড়িয়াছি, করিয়াছি ধ্যান
শত তর্ক—শত মত। ভুলাও, ভুলাও,
যত জানি সব জানা দূর করে দাও।
পথ আছে শত লক্ষ, শুধু আলো নাই।
ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী! তাই আমি চাই
একটি আলোর রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে।

উত্তরে মালিনী স্বীয় দুর্ব্বলতার কথা প্রকাশ করিয়া সুপ্রিয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছে ঃ

মনে হয়
বড়ো একাকিনী আমি, সহস্র সংশয়,
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,
নানা প্রাণী, দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ
ক্ষণিকের তরে আসে। তুমি মহাজ্ঞানী
হবে কি সহায় মোর?

এই বক্তব্যের মধ্যে মলিনীর পূর্ব্বের সত্তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়না। যে মালিনী কিছু পূর্বে বলিয়াছে ঃ

.....আজ আমি হয়েছি সবার

অথবা—

দেহ নাহি মোর, বাধা নাই,
আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ।

কিন্তু এখন সে তাহার সেই অসীম ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। কারণ আর কিছুই নহে, সুপ্রিয়ের নিকট স্বীয় প্রাণমন সমর্পণ করিয়া সে অন্তরে এবং বাহিরে বড় দীন হইয়া পরিয়াছে। সুপ্রিয় মালিনীর পূর্বোক্ত প্রশ্নে বলিয়াছে ঃ

বড় ভাগ্য মানি
যদি চাহ মোরে।

এই প্রসঙ্গে মালিনীর উত্তর বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। সে সুপ্রিয়কে বলিয়াছে ঃ

—অকারণ অশ্রুজলে ভাসে
দু'নয়ন কোন্ বেদনায়! অকস্মাৎ
আপনার 'পরে যেন পড়ে দৃষ্টিপাত
সহস্র লোকের মাঝে! সেই দুঃসময়ে
তুমি মোর বন্ধু হবে? মন্ত্রগুরু হয়ে
দিবে নবপ্রাণ?

এই বক্তব্যের দ্বারা বেশ স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে মালিনী সুপ্রিয়কে সমগ্র জীবনের বন্ধু হিসাবে ওরফে জীবনস্বামীরূপে পাইতে চাহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সমালোচক অধ্যাপক বিভূতি চৌধুরী মহাশয় সুপ্রিয়কে মালিনীর অনুচর রূপে মনে করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য উদ্ধার করিয়া বলি—"সুপ্রিয় মালিনীর নিকট বা তাঁর নবধর্মাদর্শের নিকট অভিভূতভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। মালিনীও নিজেকে 'মহাধর্ম তরণীর বালিকা কাণ্ডারী' বলে বর্ণনা করে নবধর্ম প্রতিষ্ঠায় সুপ্রিয়ের সহায়তা প্রার্থনা করেছেন। মালিনী সুপ্রিয়কে মন্ত্রগুরু বিবেচনা করছেন এবং অন্যদিকে সুপ্রিয় মালিনীর নিকট মন্ত্রশিষ্যের ন্যায় ব্যবহার করছেন।" কিন্তু আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে সুপ্রিয় মালিনীকে বলিয়াছে তাহার জানিবার কিছুই নাই। সকল শাস্ত্র সে ইতিমধ্যেই পাঠ করিয়াছে। সুতরাং সুপ্রিয় যে মালিনীর মন্ত্রশিষ্য হইতে চাহেনা তাহা স্পষ্টতই বুঝা গেল। ইহা ব্যতীত প্রেমের যাহা ধর্ম তাহাও সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে মালিনী এবং সুপ্রিয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে। একে অন্যের নিকট নিজেকে তাহার সাহচর্য বিনা অত্যন্ত অসহায় মনে করিয়াছে। অধ্যাপক চৌধুরী আরও বলিয়াছেন ঃ "কথায় কথায় মালিনী ক্ষেমংকরের প্রসঙ্গে আসলেন। ক্ষেমংকরের সংবাদ শুনতে মালিনী অতিশয় আগ্রহান্বিত হচ্ছেন।" —মালিনীর এই আগ্রহকে বিভূতি চৌধুরী মহাশয় ক্ষেমংকরের প্রতি অনুরাগ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু মালিনী ক্ষেমংকরের কথা শ্রবণ করিবার যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, তাহার ঠিক পূর্বের কথা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মালিনীর এই আগ্রহ ক্ষেমংকরের প্রতি অনুরাগ নহে। মালিনী বলিয়াছে ঃ

গৃহের বারতা সব, আত্মীয়ের মতো
সকলি প্রত্যক্ষ যেন জানিবারে পাই।

অর্থাৎ মালিনা সুপ্রিয়ের সকল কিছুর সহিতই পরিচিত হইতে চাহে এই হিসাবে ক্ষেমংকর যেহেতু সুপ্রিয়ের বন্ধু, সেই হেতু তাহার সংবাদ জানিতে সে ইচ্ছুক হইয়াছে। ইহা প্রেমিকা

মালিনীর পক্ষে যে খুবই সঙ্গত হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়।

যে সকল সমালোচক ক্ষেমংকরকে মালিনীর প্রেমিক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে, মালিনী যদি ক্ষেমংকরের অনুরাগী না হইত, তাহা হইলে সে সুপ্রিয়কে কখনই বলিত না:

হায়, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলেনা হেথা মোর গৃহদ্বারে
সৈন্যসাথে? এ ঘরে সে প্রবেশিত আসি
পূজ্য অতিথির মতো--সুচির প্রবাসী
ফিরিত স্বদেশে তার।

ইহার উত্তর হইল যে, যেহেতু বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সুপ্রিয় বিবেকের দংশনে জ্বলিতেছিল, সেই হেতু মালিনী ঐরূপ বলিয়াছে। সুপ্রিয় তাহার বিবেকের দংশনের কথা মালিনীর নিকট প্রকাশ করিবার পর মালিনী যে উপরোক্ত বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। মালিনীর এই বক্তব্য ক্ষেমংকরের প্রতি অনুরাগ পোষণ করে না। যাহাতে সুপ্রিয় অনুশোচনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিত তাহারই পথ বলিয়াছে মাত্র সে। এক্ষণে মালিনী সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে সুপ্রিয়কে হত্যা করার পর ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করিতে বলিয়াছে সে। সমালোচকদিগের মতে ইহার মাধ্যমেই ক্ষেমংকরের প্রতি মালিনীর অনুরাগ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যদি প্রকৃতই মালিনী সুপ্রিয়কে ভালবাসিত, তাহা হইলে তাহার হত্যাকারী ক্ষেমংকরকে সে কোনরূপেই ক্ষমা করিবার জন্য বলিতে পারিত না। ইহার ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় 'যথার্থ'ই বলিয়াছেন যে প্রথমতঃ মালিনী বৌদ্ধধর্মের যে অন্যতম প্রধান গুণ 'ক্ষমাধর্ম', তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করিবার জন্য বলিয়া থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রাণাধিক প্রিয় সুপ্রিয়কে হত্যা করিয়া ক্ষেমংকর যে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ক্ষেমংকরের যদি মৃত্যুদণ্ড হয়, তাহা হইলে বন্ধুহত্যার অনুশোচনার অনলে তাহাকে দগ্ধ হইতে হইবে না। সেই কারণেও মালিনী ক্ষেমংকরকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আবেদন করিয়া থাকিতে পারে।

পরিশেষে প্রশ্ন উঠিয়াছে মালিনী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করিতে বলিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল তাহার কারণ কি? প্রকৃতই যদি সে ক্ষেমংকরকে ভালবাসিয়া থাকে এবং তাহাকেই স্বামীরূপে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সুপ্রিয়ের মৃত্যু তাহার সেই আশাকে

কার্য্যকরী হইতে অনেকদূর অগ্রসর করিয়াই দিল। ইহাতে মালিনীর দুঃখের কোন কারণই লক্ষিত হয় না। কিন্তু প্রকৃত সত্য হইল, যেহেতু সে সুপ্রিয়ের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, সেইহেতু তাহার মৃত্যুতে প্রাণে যে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছে, তাহারই ফলে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য তাঁহার 'রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে মালিনী এবং সুপ্রিয় সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন ঃ "সুপ্রিয় ভক্তির পরীক্ষা দিয়েছে প্রাণ দিয়ে, মালিনী ধর্মের পরীক্ষা দিয়েছে প্রাণাধিক প্রিয় সুপ্রিয়ের হত্যাকারী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করে।" —অর্থাৎ সাধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করিবার কারণ হিসাবে মালিনীর ধর্মবোধকে বলিয়াছেন। সে যাহাই হউক, কিন্তু তিনিও সুপ্রিয়কে মালিনীর 'প্রাণাধিকপ্রিয়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

স্বনামধন্য অধ্যাপক সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সুপ্রিয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের পূর্বোক্ত ধারণাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ .... (মালিনী) তাহার পিতার কাছে অনুরোধ করিয়াছে ঃ মহারাজ ক্ষম ক্ষেমংকরে এবং এই কথা বলিয়া সুপ্রিয়ের মৃত্যুতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য, অনেক সমালোচক আবার এইরূপ অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন যে, মালিনীর হৃদয় কাহারও প্রতি ধাবিত হয় নাই। অর্থাৎ তাঁহারা মালিনীর সাধারণ মানবীয় প্রেমকে অস্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মলিনী নাটকের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, এই নাটকের ভাবের অঙ্কুর আপনা আপনি দেখা দিয়েছিল প্রকৃতির প্রতিশোধে। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে দাঁড়ায় ঃ "মানব প্রকৃতিকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে ক্ষুধিত রাখিয়া, সেই শূন্যতার উপরে মহত্তর জীবনের বেদী রচনা করিতে গেলে অকস্মাৎ তাহা ধ্বসিয়া পড়ে, মালিনী নাটক হইতে এই ইঙ্গিতটি পাওয়া যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর চিত্ত ক্ষুধিত ছিল বলিয়াই সে তপস্যায় শান্তি পায় নাই—তাহাকে রঘুর কন্যার স্নেহে আবদ্ধ হইয়া সংসারে ফিরিতে হইয়াছিল। মালিনীরও কি সেই একই ট্রাজেডি নয়? প্রথম অংশের মালিনী মানব প্রকৃতির দাবী এড়াইয়া নবধর্মের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছিল, নাটকের শেষ অংশে প্রকৃতি তাহার বলি সংগ্রহ করিয়াছে। সেই অপরাধে দেবী মালিনী কলঙ্কের গ্লানি মাথায় তুলিয়া মানবত্বের মধ্যে, এবং তাহা আদৌ গৌরবময় মানবত্ব নহে, আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহাই মানব প্রকৃতির প্রতিশোধ।"

"অথবা শরতে"

অসীমকুমার বসু

সুমিতা বসন্তকালকে ভালবেসেছিল। অথচ পাখীর ডাক কিংবা ফুলের সুবাস কোনটাই সেখানে ছিল না। স্যাঁতসেতে ভারী গলিটায় একটা জমাট হাওয়া চাপ বেধে ভাসতো। কিন্তু তবু শীত শীত হাওয়ার সঙ্গে যখন কোনকোনদিন মাঝরাতে চাঁদ ওঠতো তখন হঠাৎ-ই ওর মনে হ'ত আজ বসন্তকাল। মনে হ'ত সামনের পাঁচিলটার ঠিক ওপারেই একটা মস্ত বাগান আছে। এই নিরালা নিস্তব্ধ আলোকিত রাত্রিতে বাগানের কোমল ফুলগুলোর ওপর শিশির আর জ্যোৎস্না ঝরার শব্দ, ওর মনে হ'ত একটু কান পেতে থাকলেই ও শুনতে পাবে। ঠিক সেই সময় একটা অদ্ভুত বেদনার্ত ভাব ওকে আচ্ছন্ন করতো। পেছনে আঁস্তাকুড়ের পোড়ো জমিটার ওপর ইট বারকরা নড়বড়ে দোতলা বাড়ীটার একটা জ্যামিতিক ছায়া পড়তো। প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো সেই অদ্ভুত স্থির আবছা ছায়াটা ওর মনে হত নির্জনতাটাকে বাড়িয়ে তুলেছে। কোন কোন দিন অকারণেই ওর সমুদ্রের কথা মনে পড়তো। জ্যোৎস্না-রাতে সমুদ্রের শোভা সম্বন্ধে কোন বইতে যেন ও পড়েছিল। চোখ বুঁজে ও জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রকে অনুভব করার চেষ্টা করতো। রূপোলী ঢেউগুলো তার পায়ের সামনে ভেঙ্গে পড়ছে, আর চাঁদের আলোয় সোনালীজল চিক্‌মিক্ করছে এরকম একটা দৃশ্য চোখ বন্ধ করলেই ও দেখতে পেত। অথচ আশ্চর্য্য, কোনদিন ও সমুদ্র দেখেনি।

মাঝে মাঝে আকাশটা অন্ধকার থাকতো আর সেদিন সুমিতার বড় ভয় ভয় করতো। মনে হতো জ্যোৎস্নার সেই সমুদ্রটা অন্ধকার আকাশের ছায়ায় ছায়ায় কালো হয়ে গিয়েছে। বড় রাস্তার ওপারে বড় বড় সাদা বাড়ীগুলোকে ডুবিয়ে দিয়ে ক্রুদ্ধ সাপের মতো বিসর্পিল তীক্ষ্ণ ঢেউগুলো তাদের ফটিকমিত্র লেনের মোড়ে ঝাপসা ল্যাম্প পোষ্টটার কাছে অবধি এগিয়ে এসেছে। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টির সঙ্গে চাপা হাওয়ার শব্দ থাকলে সমুদ্রের সেই আওয়াজটা ও স্পষ্ট শুনতে পেত। একতলায় নামবার কাঠের নড়বড়ে সিঁড়িটার ওপর বেড়ালের থাবার চাপা অস্পষ্ট আওয়াজের মত একটা শব্দ উঠতো। লণ্ঠনের আলোয় রুটি বেলতে বেলতে ও কান পেতে থাকতো। ছোট ভাইটা ঢুলতে ঢুলতে শেরশাহের রাজ্যশাসনপ্রণালী মুখস্থ করতো, আর ওঘর থেকে বাতের যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে একঘেয়েমি গলায় মা জিজ্ঞাসা করতেন—রাত কত হ'ল রে সুমি। বৃষ্টিটা থেমে এই সময় চাপা হাওয়ায় সোঁ সোঁ শব্দ উঠতো, আর কড়কড় শব্দ করে দরজার কড়াটা নড়ে উঠতো

"চলার পথে"

নন্দলাল মণ্ডল

যদি চলার পথে কুড়োতে হয় কাঁটার 'পরে কাঁটা
তবু আমি কুড়িয়ে যাবো ছাড়বো না গো হাঁটা।
যে কাঁটা গো ফুটবে পায়ে
সব তুলিব কাঁটার ঘায়ে
কাটবে তখন ভাবনা আমার পথের দোটানাটা।

চলবো আমি অবহেলে সমুখ পানে চেয়ে
আসুক যত ঝঞ্ঝারাশি বুকের পরে ধেয়ে ;
আছাড় খেয়ে ধরবো মাটি
যতই পিঠে পড়ুক লাঠি
অশুচি মন করবো শুচি চোখের জলে নেয়ে।
আপনমনে আপনি গেয়ে কাজ করিব গোপন সাঁঝে
কান পাতিব সুদূর পানে ; ঘণ্টা যদি নাইবা বাজে—
নাইবা ডাকুক আমায় যেতে
রইবো তবু আপনি মেতে
বিবেক তবু ভাবাক মোরে ভয় কিবা জয় দুঃখ লাজে ।

মাঝি হয়ে দিব পাড়ি ওই ওপারের নদীর তটে
পণ্য নিয়ে যাবো আমি সাগর পারের প্রাচীন মঠে ;
দেখবো যখন তরী মাঝে
নিল কিবা নিল না যে
ফিরায়ে নিয়ে পূর্ণ তরী আসবো আবার আমার ঘাটে।

তরীখানি যায় গো যদি পান্না সোনায় সত্যি ভরে
মুখ ফিরায়ে ডাঙার দিকে চলবো তখন সরে সরে—
ফিরি করি ভবের হাটে
কিম্বা ফেলে দূরের মাঠে—
আবার আমি আসবো ফিরি ফেলে যাওয়া শূন্য ঘরে।

গাঙ চিল

শ্রীমদনমোহন হালদার

অনন্ত অসীম শূন্য দিগন্তের চুম্বন বিলাসী
ঊর্ধে তব, উদ্দাম সমুদ্র নীচে—উড়ে চল অসীম তিয়াসী ;
একান্ত নির্ভীক চিত্ত, দৃষ্টি যে স্বপ্নিল
অবারণ চলার পিয়াসী—বন্ধু, ওগো গাঙ চিল।
ডানায় নিয়েছ মেখে চঞ্চল বিদ্যুৎ
বজ্রকে শুষেছ কণ্ঠে, তুমি বন্ধু, একান্ত অদ্ভুত।
চলে যাও, উড়ে যাও দকহারা, নামহারা—
দ্বীপান্তরে, চূর্ণ করি' দিগধূর মিথ্যা মায়াকারা।
অশ্রান্ত ডানার নির্মন ঝাপটায়—
তোমার চলার বেগ,—আমার ঝিমানো রক্তে জাগায়
সফেন উচ্ছ্বাস—ছিঁড়ে ফেলি' প্রিয়ার গাঁটছড়া
মেনে নিই—'নান্য পন্থা' : তব সাথে উড়ে যাওয়া ছাড়া।
অনন্ত অসীম শূন্যে উড়ে চলো একান্ত উদ্দাম,
গ্রহ-তারা সম অবিরাম চলার নেশা না-মানো বিশ্রাম।
হিমালয়ও হার মানে যেথা মানুষের কামনা দুর্জয়!
অসীম-তিয়াসী তাই, বন্ধু, তুমি একান্ত বিস্ময়!

দৃঢ় হোক্, দৃপ্ত হোক তোমার-আমার মিতালী
করুক গর্জমান সমুদ্র ভ্রূকুটি—উদ্দাম বাতাস রচুক গিতালী
তোমার ডানায় ; বিদ্যুৎ-স্পন্দিত বক্ষ, উড়ে যাব, দাঁড়াব না কভু একতিল,
তোমা সাথে আমরণ, ওগো বন্ধু, ওগো গাঙ চিল।
বাসন্তী-বৈকালী রোদ তোমার পাখায় লেগে করে ঝিল্ মিল্
প্রিয়ার আঁখির মায়ায় নহ অবরুদ্ধ,—মুক্তপ্রাণ, প্রিয়বন্ধু ওগো গাঙ চিল।

এই সময়। কড়ানড়ার শব্দেই ও বুঝতো অফিসের পর রাত্রিরের টিউশনীটা সেরে বাবা এইবার বাড়ী ফিরেছেন। একতলায় সুরকি বিছানো উঠোনটায় গোড়ালীডোবা ঘোলা জল জমতো। ছাদের মরচে পরা জলের পাইপ বেয়ে কলকল করে জল পড়তো। ঝিঁ ঝিঁ ডাকের সঙ্গে অদ্ভুত একটা মিল ছিল এই শব্দের। খিল খুলে দিলে মাথা নীচু করে ছোট দরজাটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেন বাবা। বিড়ির লালচে জোনাকি আলোয় বাবার শীর্ণ মুখের গভীর রেখাগুলো চোখে পড়তো সুমিতার। ভিজে ছাতাটা মুড়তে মুড়তে বিড়িতে শেষটান দিয়ে খুক্ খুক্ করে কেশে বাবা বলতেন—শালা, জব্বর শীত পড়েছে আজকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করতেন—হ্যাঁরে, মেধোটা ফিরেছে? না বলতে হ'ত সুমিতাকে। যেন একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন বাবা—বুড়ো বাপটা সারাদিন গরুর মত খাটবে, আর ছেলেটা··

সুমিতা জানে শেষ ট্রামের ঘস্ ঘস্ আওয়াজটা মিলিয়ে যাবার পর চোরের মত ঘরে ঢুকে ঢাকা দেওয়া ভাতের থালাটা খুলবে মাধব। নীচের তলার নিরীহ বউটি তখন মাতাল স্বামীর পা থেকে মোজা খুলে নিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেবে। কয়েকটা অশ্লীল শব্দ আর কাঁচের জিনিস ভাঙ্গার টুকরো আওয়াজ ভেসে আসবে আর দক্ষিণ দিকের আম গাছটায় কয়েকটা কাক ঘুমের ঘোরে পাখা ঝাপটাবে। এই সময় অন্ধকার রাত্রিটা আরও ঘন হয়ে নামবে। ভাতের ঢাকা খোলার শব্দে সূক্ষ্ম তন্দ্রার পর্দাটা পাতলা কাঁচের বাসনের মত রিনঝিন করে ভেঙ্গে যাবে। ভাঙ্গতেই মাধবের কথা মনে পড়বে, আহা বেচারী! সুমিতা ভাববে—বেকারী যন্ত্রণায় সারাদিন পথে পথে অস্থির হয়ে কাটিয়েছে, কাটাচ্ছে। সেই মুহূর্তে ভগবানের কথা মনে পড়বে। ভগবান তুমি একটা চাকরী জোগাড় করে দাও, সুমিতা মনে মনে বলবে। কথাটা বলে একটা অদ্ভুত স্বস্তি অনুভব করবে সুমিতা। "তরকারীটা গরম করে দেবো ছোড়দা?" সুমিতা কোমল গলায় বলবে। ভাত গিলে জল খেতে খেতে মাধব বলবে—না, না, তুই ঘুমো। কোন সকালে উঠিস।

এরপরে বাইরে রকে বালতি থেকে জল নিয়ে মাধব আঁচাবে। সিমেন্টের রকে জল পড়ার শব্দে ওর কলের কথা, ভোর বেলার কথা মনে পড়বে। আজ ক'দিন থেকে ভোরবেলায় ভীষণ কুয়াশা পড়ছে—সুমিতা ভাববে, উনুনের ধোঁয়াকে আর আলাদা করে চেনা যায় না। ভোরবেলা না উঠলে ঐ একটা কলে তিন ঘরের জল নেওয়া দায়। নীচের তলার বউটা রাত থাকতে উঠে কলের সামনে বালতি পেতে রাখবে লাইন করে। যেন এর ফলেই তার আগে জল নেওয়ার দাবিটা আইনতঃ সংরক্ষিত হয়ে রইলো।

রাখুক গে, ঝগড়া করে জল নেওয়া—বস্তি! বস্তি! সুমিতা ভাবলো। তাছাড়া ওর স্বামীটা যেন কোন কারখানায় কাজ করে। আটটার ভোঁ বাজবার আগেই কোনরকমে নাকে কানে গুঁজে ছুটতে হয়। দেরী হলে নিরীহ বউটার সঙ্গে ভীষণ রাগারাগি করবে। সাইকেলটা নিয়ে চৌকাঠ পেরোতে পেরোতে কতকটা আত্মগতভাবে বলবে—শালা, কানা সাহেবটা আজ ঠিক মাইনে কাটবে। দেরী হ'লে মাইনে কাটে সুমিতা জানতো।

সাইকেলের ক্যারিয়ারে রুটি তরকারীর টিফিন কৌটোটা বেঁধে সাইকেলে উঠতে উঠতে লোকটা বলতো—গণেশ এলে বলবে আমি কারখানার কাজে বাইরে গেছি। শা—র তাগাদার ঠেলায় ···। সাইকেলটা যতক্ষণ না বাঁক নিয়ে পীচের রাস্তাটায় ওঠে বউটি চেয়ে থাকতো। তারপর শান্ত ছেলে দুটিকে চান করিয়ে খাইয়ে সুমিতাকে বলতো—কি রান্না হ'লো?

দূরে কারখানার ধোঁয়া ছাড়ার কালো লম্বা চোঙাটা থেকে আটটার ভোঁ বাজতো এই সময়। বাবার উঠতে আরও আধ ঘণ্টা। কলার ছেঁড়া সার্টটা চড়িয়ে পায়ে চটি গলাতে গলাতে মাধব নীচে নামবে এই সময় দুদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে অনুনয়ের সুরে সুমিতাকে বলবে—চার আনা পয়সা দিতে পারিস সুমি।

দশটা বাজলে চান করে খেয়েদেয়ে দুর্গাপট নমস্কার করে ছাতাটা নিয়ে অফিসে যেতেন বাবা। ছোট ভাইটা চান করতে যেতো এই সময়। চান করতে যাবার আগে সুমিতা ওকে এক আনা দিয়ে বাজার থেকে কদবেল আনতে পাঠাতো। কদবেলের কথা মনে হ'লেই সুমিতার জিভে জল আসতো। ভাত খেতে খেতে ছোট ভাইটা মনে করিয়ে দিত—আমার জন্য আচার রাখবি কিন্তু দিদি। হেসে সুমিতা বলতো—রাখবো।

ছোট ভাইটা স্কুল চলে গেলে সুমিতা চান করে ছাদে কাপড় শুকোতে দিয়ে আসতো। ইট বার করা খয়েরী ছাদটার কার্ণিশে বট আর অশ্বত্থ চারার ফাটলের দিকে চেয়ে সুমিতার মনে হ'ত, যে কোনদিন এটা ভেঙ্গে পড়তে পারে।

গলির মোড়ে মেয়ে ইস্কুলের বাসটা এসে হর্ণ বাজাবে এই সময়। দত্তদের বাড়ীর মেয়েটা ব্যাগ ঝুলিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে। দরজাটা বন্ধ করে দারোয়ানটা হাঁকবে—চলো ঠিক্ হ্যায়। একরাশ কালো ধোঁয়া উড়িয়ে বাসটা ঘস ঘস করে অদৃশ্য হ'বে। সুমিতা ভাবতো সে যদি এখনও স্কুলে পড়তো। ওদের স্কুলের মেজ দিদিমণির কথা মনে পড়তো। বেশ ফর্সা আর সুন্দর ছিল। মোটেই বকতে পারতো না। কিন্তু বেশ পড়াতো, কত গল্প বলতো আর ডান হাতে ঘড়ি পরতো। মেয়েরা ঐ দিদিমণির নামে নানারকম

কথা বলতো আর হাসাহাসি করতো। দিদিমণিদের সম্বন্ধে ওরকম বলতে নেই—সুমিতা ভাবতো। সেই যে লম্বা বিনুনী করা মেয়েটা, কি নাম যেন, ছন্দিমা না কি, ব্যাগে করে লুকিয়ে নীল খামে ভরা চিঠি নিয়ে আসতো। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেন গিলতো। মাঝে মাঝে কোঁকড়ানো চুল একটা ছেলের ছবি দেখাতো। সবাই কাড়াকাড়ি করে তাই দেখতো। কেবল মোটা মেয়েটা নাক সিঁটকে বলতো, যাই বলো রঙটা তেমন ফর্সা নয়।

কার্ণিশে বসে একটা কাক কর্কশস্বরে ডাকতো। আকাশের দিকে চোখ তুলে নীল আকাশ আর সাদা টুকরো মেঘগুলো দেখতে পেতো সুমিতা। সকালের মিষ্টি নরম রোদটা একটু একটু করে কড়া হচ্ছে। সুমিতা জানতো মাকে এই সময় চানের জল গরম করে দিতে হবে।

দুপুরবেলা ঘুম থেকে উঠে ভারী চোখে আচারের বাটিটা নিয়ে ও ছাদে আসতো। রোদে জ্বলা আকাশটায় একটা চিল ঘুরপাক খেতো। দুপুরটা গাঢ় আর নিস্তব্ধ হ'ত এই সময়। কাঁশির ঠংঠং শব্দ করে বাসনওলাটা গলিতে ঢুকতো, সুমিতা জানতো বিক্রীর চেয়ে পুরানো কাঁসার থালা বাসন কেনার দিকেই ওর ঝোক বেশী। মাথায় চৌকো চোঙাওলা কাঠের বাক্সটা চাপিয়ে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে ছবি দেখানো লোকটা আসতো কোন কোন দিন। ডুগডুগির শব্দে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো ভিড় জমাতো। বাক্সের সঙ্গে লাগানো গ্রামোফোনটায় হিন্দী ছবির একটা পুরানো রেকর্ড বাজাতো লোকটা। চোঙার মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত নাকি নাকি সুর বেরোত। সুমিতার হাসি পেত। গান না কান্না বোঝা দায়।

দূরে কোথায় মাইক বাজছে। বাবলু বলছিল বটে বাসষ্ট্যাণ্ডের সামনে রায়েদের মাঠে, রাসের মেলায় সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। একবার কালোমামার সঙ্গে ওরা সার্কাস দেখতে গিয়েছিল। বাবলু তখনও হয়নি। সেই বেঁটে জোকারটার কথা মনে পড়লো। বাবাঃ কি বেঁটে। রাণীদির বরও বেঁটে। দুবছর আগে পিসীমার বাড়ীতে দেখেছিল। মেলাতে কি ভিড়! সুমিতার মনে পড়লো—মাতো সেবারে হারিয়েই গেলেন। শেষকালে কালোমামা আর ও দুলাইনে খুঁজতে লাগলো। মেয়েদের লাইনে আবার ছেলেদের ঢুকতে দিচ্ছিল না। শেষকালে সেই ফর্সামতো, ব্যাজপরা সুন্দর ছেলেটা তার বন্ধুদের নিয়ে ঠিক খুঁজে বার করলো। "আপনি ভয় পাবেন না, এখানে বসুন, আমরা ঠিক খুঁজে বার করছি। 'আপনি' 'আপনি' কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগছিলো, আর সুমিতা ভাবলো—ছেলেটা বেশ সুন্দর আর ভদ্র।

পড়ন্ত হলুদ রোদটা কার্ণিশ বেয়ে নীচে নামতো। সুমিতা জানতো কলতলা অবধি পৌঁচতে পৌচতে এই রোদটা ফুরিয়ে যাবে।

ঘরের ভেতর ছায়া ছায়া ভাব, একটু পরে নিঃশব্দে সেই বেড়াল-থাবা চাপা অন্ধকারটা নামবে। সুমিতা ভাবলো আজকে চাঁদ উঠতে পারে।

আবছা তন্দ্রার মধ্যে সুমিতার মনে হ'ল চাঁদ উঠছে। শিরশিরে হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপছে। ফুলগুলোর ওপরে টুপটাপ টুপটাপ শিশির ঝরছে। একটা মিষ্টি অস্পষ্ট গন্ধ। সুন্দর ছেলেটা বললো, "ভয় পাবেন না, আপনি বসুন, আমরা ঠিক খুঁজে বার করছি।"

সময়টা শরৎ না বসন্ত ঘুমের গভীরে তলিয়ে যেতে যেতে সুমিতা ঠিক বুঝতে পারলো না।

ছায়া ও কায়া

অরুণাভ সরকার

নীল জলে লীন হায় বিহগের ছায়া
আকাশের বুকে তার উড়ে যায় কায়া
ছায়া সাথে জল মিশি এক একাকার
মিলিতে না পারি কায়া করে হাহাকার
দু'জনেই দুজনায় এক হতে চায়—
নীলজলা নদী শুধু যায় বয়ে যায়—
ফোঁটা ফোঁটা নীরধার ছলো ছলো আঁখি
জলপটে কায়া যায় ছায়া ছবি আঁকি।

শপথ

তপনকুমার ভট্টাচার্য

ঝঞ্ঝা-প্রলয়েডরি না আমরা,
মাতৃভূমির রাখিতে মান—
শত্রু-দম্ভ করিব চূর্ণ
মোরা ভারতের নওজওয়ান।
হুমকীতে মোরা হই নাক নত,
শির উঁচু রেখে চলতে জানি ;
আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ
শিবসুন্দরে বন্ধু মানি।
আমাদের দেশ লুণ্ঠিতে যারা
কুণ্ঠিত নয়, লজ্জাদীন—
শৌর্য-দম্ভে ভেবেছে তাহারা
শান্তি সাধক শক্তিহীন।
আমরা 'জওয়ান', শঙ্কা জানিনা
সিংহের বল মোদের মনে,
নির্ভয়ে মোরা বধিব শত্রু
সীমান্তে ভীম-রণাঙ্গনে।
পূর্বাচলের নবারুণ সম
এ ভারত আজি উঠেছে জাগি,
নবীন শপথে বলীয়ান হয়ে
বিধাতার কাছে আশিষ মাগি।

কলঙ্কিনী

বিভূতিভূষণ ঘোষাল

বুড়ী···একেবারে থুড়থুড়ে হয়ে গেছে, যেন একটা বুড়ো বট গাছ হাজার বছরের হাজার রকমের ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে, তাই আজ সে হেলে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে একটা বিশাল বেদনার ভার বুকে চেপে।

গ্রামের পশ্চিম দিকে ঠিক শ্মশানটার সামনে একটা পাতার ঘর···তারি মধ্যে বাস করে সে···ঘরটাও ঠিক তারি মতো ঝড়ঝাপটা খাওয়া···তার মতই কুঁজো, গাঁয়ের লোকে সবাই তাকে বলে "ডাইনীবুড়ী"। বয়স তার কত তা কেউ আন্দাজ করে বলতে পারে না। গাঁয়ের যে ঠাকুর্দ্দা সে তো নাতি মহলে গল্প করে বেড়ায় সে তার ছেলেবেলা থেকে বুড়ীকে এই রকমই সে দেখে আস্‌চে। গাঁয়ের মা'রা ছেলেদের ঘুম পাড়াবার সময় এই ডাইনীবুড়ীর নাম করে ভয় দেখায়।

কিন্তু বাড়ীতে কোনো একটা শক্ত ব্যারাম হোলেই সকলেই ছোটে এই বুড়ীর কাছে। সে নাকি অনেক গাছ গাছড়া চেনে, অনেক দৈব ওষুধ নাকি তার কাছে আছে। আড়ালে সবাই "ডাইনীবুড়ী", কিন্তু সামনে আদর করে ডাকে "আয়ি"।

সবার বাড়ীতে কাজকর্মে বুড়ীর পাত বরাদ্দ আছে। সে যে শুধু খেতে আসে তা নয়, তার বুড়ো হাড়ে যতটুকু খাটতে পারে, সেটুকুতে সে কৃপণতা করে না মোটেই, সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত নিমন্ত্রণ বাড়ীর এটা ওটা সেটা কাজ করে রাত্তির বেলা প্রসাদ পেয়ে লাঠি হাতে গুটি গুটি যায় তার সেই শ্মশান ধারের কুঁড়েখানির দিকে। অন্ধকার রাত্তির হ'লে যে কেউ তাকে পথে দেখবে সে সময়, তাকে আঁৎকে উঠতেই হ'বে—তা সে যত বড়ই সাহসী পুরুষ হোক্ না কেন। বুড়ী বিজ্ বিজ্ করে বকতে বকতে পথ দিয়ে চলে,—মনে হয় যেন কি বুঝতে না-পারা মন্ত্র পড়ে সে ডাকিনী প্রেতিনীর আহ্বান করছে! অনেক রাত পর্যন্ত বুড়ীর কুঁড়েতে দীপ জ্বলে। পথের লোকেরা যাদের এ গাঁয়ে বাড়ী না, তারা মনে করে বুঝি শ্মশানের মাঝে ভূতের আলো জ্বলছে।

সারা সকাল ধরে সে গোবর তুলে বেড়ায়। দুপুর বেলা ঘুঁটে দেয় আর বিকেলে সেগুলো নিয়ে বেচে এসে যা কিছু রোজগার হয় তাই দিয়ে কোন রকমে সে নিজকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তার এই নিত্যকর্ম ছাড়া তার জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে কেউ কিছুই জানে না। যদিও নানান গুজব গাঁয়ের মাঝে রং ফলানো হয়ে তার নামের চার পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেচে—গুটি পোকার চার পাশে রেশমী সুতার মতো।

সেদিন সকালে শীত পড়েছিল বেজায়, বুড়ী একটা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে ঠিক তার কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার হাত পা শীতের তোড়ে নীল অসাড় হয়ে গিয়েছিলো।

একটা গরু এসে তার ঘরের ভিতর ঢুকবার চেষ্টা করছিল, বুড়ী একটা ভাঙা গাছের ডাল তুলে তা'কে দূর থেকে এক ঘা কসিয়ে দিয়ে আপন মনে বিড়ির্ বিড়ির্ করে বকতে লাগলো। মনে হলো যেন যার গরু তার সবংশে যমের বাড়ী যাবার নিমন্ত্রণ করছে সে। গরুটা ঘা খেয়ে ল্যাজ তুলে চম্পট দিলে একেবারে বুড়ীর ত্রিসীমানা ছেড়ে।

এক পাশে একটা খুব ছোট ঝোপের মত ছিল। বুড়ী আপন মনে সেদিকে গিয়ে যেন কি দেখে চমকে উঠে পিছিয়ে গেল। চোখে সে ভালো দেখতে পায় না। তাই ভুল হয়েছে মনে করে ঝুকে পড়ে দেখলে, ঠিক তো, একটা রাঙা টুকটুকে মেয়ে, সবে হয়েছে বলে মনে হয়, অসাড় হয়ে রদ্দুরে পড়ে আছে। প্রথমে সে ভাবলে বুঝি মরা মেয়ে কে শ্মশানে ফেলে দিয়ে গেছে। কিন্তু মুখটা তার গায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বুড়ী দেখলে যে তার চোখ দুটো নিট্ নিট্ করছে। সে প্রথমে মনে করলো হয়তো কোন ছোটলোকের মেয়ে, তার মা এখানে তাকে শুইয়ে রেখে কাছেই কোথাও আছে। চোখের ভুরুর উপর হাতের চেটো তুলে আশে পাশে চারিদিকে দেখলো অনেকক্ষণ ধরে, কেউ পড়লো না তার নজরে। লোকে বলে ডাইনী বুড়ীর বয়সের গাছ পাথর নেই। কিন্তু এই বয়সের মধ্যে সে এমনটা তো কখনো দেখেনি। বিস্ময়ে অবাক হয়ে মেয়েটার পানে চেয়ে রইলো।

খানিক পরে কি জানি কেন মেয়েটা কেঁদে উঠলো। বুড়ী এতক্ষণ নিজের কর্ত্তব্যটা স্থির করতে পারেনি। শিশুর কান্না শুনে এক মুহূর্ত্তে তার কর্ত্তব্য স্থির হয়ে গেল। সে আস্তে আস্তে তাকে তুলে সর্ব্বাঙ্গ কাঁথা চাপা দিয়ে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। তার ঘরে তক্তোপোষ, কি বিছানার পাট ছিল না মোটেই। ঘরের এক কোণে খড় বিছিয়ে তার উপর একটা ছেঁড়া কাঁথা বিছিয়ে দিলো, মেয়েটাকে সেখানে শুইয়ে আগুন জ্বেলে তাকে সেক দিতে আরম্ভ করলো, এসব তো হল ঠিক। কিন্তু এখন দুধ পায় কোথায়? বুড়ীর একটা ছাগল ছিল। সে ছাগলদুধ গাঁয়ের এক পরিবারে বরাদ্দ ছিল। বুড়ী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে ছাগল দুয়ে তার খানিকটা একটু গরম করে খাইয়ে দিলে।

সব তো এক রকম চুকে গেল। কিন্তু বুড়ী বিষম ভাবনায় পরে গেল। তাকে তো গাঁয়ে রোজ একবার করে বেরুতে হবে। সে সময় মেয়েটাকে কার কাছে রেখে যাবে? তার প্রতিবেশী ছিল না। একটু দূরে মুদ্দফরাসের বাস। কিন্তু তাদের কাছেত এই সোনার পুতুল দিয়ে যেতে পারে না সে!

মেয়েটার জন্মের আসল ব্যাপার সে বুঝতে পেরেছিল। তার বাপমার খোঁজ করা যে অসম্ভব, তার খোঁজ পেলেও যে সেখানে এই নিরপরাধ শিশুটির প্রবেশ নিষেধ একথা সে বিলক্ষণ বুঝেছিল।···তাহলে এখন সে কি করে? ছদিন পরে সংসারের মায়া কাটিয়ে যাকে কোন্ এক অজানা দেশের দিকে যাত্রা করতে হবে···পৃথিবীতে আপনার বলতে যার কেউ নেই··লোক চক্ষুর আড়ালে ঠিক শ্মশান দেবতার পাশে যে তার ঝড় ঝাপটা যাওয়া দুঃখের জীবনটাকে কোন রকমে কাটিয়ে দিচ্ছে···দয়ামায়া ভালোবাসার ধার সে অনেক দিন থেকেই ধারেনা···তাকে এ মায়ার বাঁধনে বেঁধে কি করলে ভগবান? তার চোখের সামনে যে সব রঙীন আলো একদিন মায়ার কিরণে উজ্জ্বল হয়ে ভাসছিল, সেগুলো তো একে একে নিভিয়ে দিলে তবে আজ কেন আর একটা আলো জ্বেলে তাকে লুব্ধ করে বিব্রত করা? বুড়ী কিছুই ভেবে উঠতে পারলো না।

ঘরে একলা ফেলে যেতে তো পারে না। তাই সে এক মতলব বার করলো। বিকেলবেলা যখন ঘুঁটে বেচতে গাঁয়ে গেল, মেয়েটাকে একটা কাপড় দিয়ে পিঠে বেঁধে নিয়ে চললো। যার নজরে পড়লো সেই নির্বাক হয়ে গেল বিস্ময়ে। এ মেয়ে বুড়ী কোথায় পেলো? আশ্চর্য্য! জিজ্ঞাসা করতে অনেকের সাহসে কুলালো না। যারা সাহস করে জিজ্ঞাসা করলো তারা ঠিক উত্তরই পেলো।

যে বাড়ীতে ছাগল দুধ যোগাত তাদের গিয়ে বললো, "এবার থেকে দিদি, আধসের দুধ কম হবে।"

গিন্নি বললেন, "কেন?"

পিঠের বোঝা দেখিয়ে বুড়ী হেসে বলে—"পরের খুন ঘাড়ে নিয়েচি দিদি, দেখতেই পাচ্ছ। এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো?"

গিন্নি হেসে বললো,—পারবি তো রে? তোর তো এই অবস্থা ওকে দেখবে শুনবে কে?"

বুড়ী ওপর দিকে হাত বাড়িয়ে বললো—"জীব দিয়েছেন যিনি তিনিই ওকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আমার কি হাত আছে, দিদি?" বলে, বুড়ী পিঠের বোঝাটাকে ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে গেল। গিন্নি তখন বলছিলেন, "কোন আবাগীর বাছা রে! আহা বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক!"

একদিন···ছদিন···তিনদিন গেল। চতুর্থ দিনে দুপুরবেলা বুড়ী মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে বাইরে ঘুঁটে দিচ্ছে, এমন সময় একটি যুবতী এসে সেখানে দাঁড়ালো। রঙ বেশ

ফর্সা···পরনে থান···গায়ে গহনা কিছুই নেই, কেবল ছুগাছা সরু সরু রুলি। বুড়ী প্রথমটা তাকে চিনতে পারে নি, খানিকটা লক্ষ্য করবার পর আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—"কে, শৈলদি ?"

শৈল বললো, "হাঁ, আয়ি, আমি।"

"তুই এখানে, দিদি ?"

শৈল সে গাঁয়ের বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। তার বাবা নারাণ মুখুজ্যে জমিদারের নায়েব। অনেক টাকা খরচ করে ছেলেবেলায় কলকাতায় কোন বড়লোকের ঘরে নারাণ মুখুজ্যে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বরাতে সইলো না। তাই এগার বছর বয়সেই শৈলকে বিধবা হতে হয়েছিল। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ, তাই পাড়াগাঁয়ে পাড়া বেড়ানো নিষেধ না থাকলেও শৈল বড় কোথাও যাওয়া আসা করতো না। সেই জন্যেই বুড়ী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—তুই এখানে দিদি ? কি খবর ?

শৈল বললো,—"তোর কুড়ানো মেয়েটিকে একবার দেখতে এসেচি।" বুড়ী হেসে বললো,—"তার জন্যে এদ্দুর এলি কেন দিদি ? রোজই তো আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।"

* * * * *

মেয়েটির পানে চেয়ে থাকতে থাকতে শৈলর ছুচোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। সে কি তোড়! কোন রকমেই শৈল তাকে সামলাতে পারলো না।

বুড়ী আশ্চর্য্য হয়ে বললো, "ওকি দিদি ? কাঁদছিস্ কেন ?

শৈলের কান্না দ্বিগুণ বেগে চলতে লাগলো। বুড়ীর প্রাণে একটা সন্দেহ যেন একবার উঁকি মেরে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সেটাকে ঝেড়ে ফেলে দিলে নারাণ মুখুজ্যের মেয়ে ছিঃ।

খানিক পরে শৈল মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমোর উপর চুমোতে তার গাল হাত গা ভরে দিতে লাগলো। অবাক হয়ে তাদের ছুজনকে দেখতে দেখতে বুড়ীর মনে সেই সন্দেহটা যেন ঘনীভূত হয়ে এল। মেয়েটার মুখে যেন শৈলরই ছায়া বসানো আছে! তবে কি সত্যি ? বুড়ী কি যেন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল। শৈলর মুখ দেখে থেমে গেল। তাতে সে কি কাতরতাই মাখানো আছে!

শৈলর যখন হুঁস হোল তখন সূর্য্য আকাশের পশ্চিম কোনে ঢলে পড় পড় হয়েছে। সে হঠাৎ চমকে উঠে বুড়ীর হাতে কতকগুলো নোট গুঁজে দিয়ে বললো—আমি চললুম। এই টাকা কটাতে মেয়েটার আর তোমার অনেক দিন খোরাক হবে। তোমার

আর ঘুঁটে বেচতে হবে না। এই বলে সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

বুড়ী চেঁচিয়ে বললো, "দিদি, দিদি, একটা কথা বলে যা।" তোরই কি···দরজার পাশ থেকে বুড়ীর গালে হাত চাপা দিয়ে শৈল বললো,—"চুপ।" তার পর হন্ হন্ করে সে বেরিয়ে চলে গেল।

দুর্গাপুর গ্রামের জমিদার ভৈরব বাড়ুজ্যের এক নাতনী হয়েছিল। জন্মের দিনই আতুড় থেকে সেই মেয়ে চুরি যায়। তার ঠাকুরমা জমিদার গিন্নি সোনার হার দিয়ে তার মুখ দেখেছিলেন, সেই হারটা তার গলায় ছিল। তারি লোভে সেইদিন ভোরে মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে যায়। আঁতুড়ের ঝিও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কাজেই সন্দেহটা গিয়ে পড়লো তারি ওপরে।

সে দিন সকালে বুড়ীর ঘর পুলিশে ঘেরাও করে। বুড়ী একটা মেয়ে পুষচে এই সন্ধান পেয়েই পুলিশ স্থির সিদ্ধান্ত করলো এ মেয়ে জমীদারের নাতনী না হয়ে যায় না।

পুলিশ ঘেরাও এর কথাটা গাঁয়ে এতক্ষণ রটে গিয়েছিল। পুলিশ বুড়ীর ওপর খুবই তম্বি করতে লাগলো। তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলো। বুড়ী যা জানতো সেইটেই সকলকে বললো। তাছাড়া আর কিছু বলতে পারলো না।

পুলিশ বুড়ীর ঘর সন্ধান করতে আরম্ভ করলো। হার পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু কতকগুলো নোট আর টাকা পাওয়া গেল। দারোগা জিজ্ঞেস করলো "এসব তুই কোথা থেকে পেলি?" তার সন্দেহ হয়েছিল জমীদার বাড়ীর মেয়ে চুরি বুড়ীরই কাজ, আতুড়ের ঝি তারই চর, এসব টাকা সেই হার বিক্রী টাকারই কতক। এটা শুধু সন্দেহ নয়, দারোগার স্থির বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নইলে বুড়ী এতগুলো টাকা পেলো কোথা থেকে। সে যে অত বড় ব্যাপারের এমন সহজে একটা কিনারা করে ফেলেছে একথা ভেবে প্রমোশনের আশায় তার বুকটা দশ হাত হয়ে উঠলো।

দারোগার প্রশ্নের উত্তরে বুড়ী শুধু বললো, "ও টাকা আমার জমানো টাকা।" মুখ খিঁচিয়ে দারোগা বললো, "জমানো টাকা! বুড়ো হয়েছিস্ তবুও মিথ্যা কথা বলতে একটুও ভয় হচ্ছে না? জমানো টাকা! কি করে রোজগার করেছিস্ শুনি।"

বুড়ী মিথ্যাই বলছিল বটে। কিন্তু না বলে তো উপায় নেই। তাই সে স্থির স্বরে বললো, "কেন বাবু, ঘুঁটে বেচে, লোকের বাড়ী খেটে এদ্দিন ধরে আমি কি এই

কটা টাকা জমাতে পারি না? তা ছাড়া পালে পার্ব্বনে গাঁয়ের অনেকেই তো আমাকে পার্ব্বনি দেয়।"

দারোগা একটা ধমক দিয়ে বললো, "ফের মিথ্যা কথা পাজী বেটী! যে কটা দাঁত আছে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেব, জানিস্?"

তার সঙ্গে একজন লোক বললো, "দারোগা সাহেব, মিছিমিছি ওর সঙ্গে কথা কাটা-কাটি করে তো কোন লাভ নেই। চলুন ওকে থানায় নিয়ে যাওয়া যাক। সেখানেই সব প্রকাশ হয়ে যাবে।"

দারোগা একটু শান্ত হয়ে বললো, "তাই চল।" তার পর একজন জমাদারকে বললো "মেয়েটাকে তুলে নে।" বুড়ীর পিঠে একটা হাঁটুর গুঁতো মেরে বললো, চলরে চল।"

ততক্ষণ ভীড় জমে গিয়েছিল। কিন্তু দারোগার কাজে কেউ এতটুকু বাধা দিলো না।

বুড়ী মেয়েটা কোলের ভিতর জড়িয়ে ধরে বললো,—"তোমাদের পায়ে পড়ি, বাবা সকল, আমায় থানায় নিয়ে যেওনা, মেয়েটাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিওনা! তাহলে আমি মরে যাব, আর বাঁচবো না।

ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলো,—"মরবার কি আর বয়স হয়ান? আর বেঁচে কি হবে?"

কথাটা শুনে সকলেই হাসতে লাগলো, বুড়ী মেয়েটাকে জড়িয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দারোগা বললো—"যাবি না? ...তবে জোর করে নিয়ে যেতে হোল দেখচি। হনুমান সিং, ওর হাতটা ধরে টেনে নিয়ে আয় তো।"

বুড়ী চেঁচিয়ে উঠলো,—"আমায় ছেড়ে দে, বাবা। আমার দুধের বাছা থানায় গেলে মরে যাবে। ছেড়ে দে, বাবা, যে টাকাগুলো নিয়েচিস্, সেগুলো নিয়ে আমাদের ছেড়ে দে।"

দারোগা হেসে বললো—"এ দিকে টন্‌কো আছেন! আবার ঘুসের লোভ দেখানো হচ্ছে।" বলেই বুড়ীর পিঠে একটা হাটুর গুতো মারলো! বুড়ী সামালতে না পেরে পড়ে গেল। মেয়েটার বিশেষ কিছু চোট লাগেনি বটে, কিন্তু সে ভীষণ চেঁচিয়ে উঠলো!

ভীড় ঠেলে উন্মাদিনীর মত কে একজন এসে বুড়ীর কোল থেকে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে বললো,—

"ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা বলে যাও, কেন আমার দুধের বাছাকে মেরে ফেলছ? ওগো তোমরা-কি মানুষ নও!"

ভীড়ের মধ্য থেকে অস্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো, শৈল!—"নারাণ মুখুজ্যের মেয়ে!" "কি ভয়ানক ব্যাপার!"

দারোগাও যেন একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো! সে বললো—"মা, ও মেয়েটিকে যে দিতে হবে। ওর বাপমার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে যে!"

শৈল চীৎকার করে বললো,—"দারোগা সাহেব, তোমরা যা' ভাবছো তা' নয় গো নয়! আমিই যে ওর মা!"

জনতার ভিতর শিউরে ওঠার একটা ভাব লক্ষ্য হোল। কিন্তু তখনি মিলিয়ে গেল। সবাই ভাবলে, শৈল বুঝি পাগল হয়ে গেছে, তাই আবোল তাবোল বকছে।

শৈল সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললো,—"বিশ্বাস করছো না! আমি বিধবা তাই বিশ্বাস হচ্ছে না! বিধবাও যে মানুষ, সে তো দেবী নয়, তারও ভুল হয় গো, তারও ভুল হয়! একদিন লজ্জায় কষ্টে ওকে ফেলে দিয়েছিলাম, আজ আমার বলতে বাধা নেই যে, আমিই ওর মা!"

যারা শৈলর দিকে ফিরে তাকালো, দেখলে তারা—মাতৃ গর্ব্বে মহীয়সী রমণী কন্যা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জগদ্ধাত্রীর মত—এতটুকু কলঙ্কের ছাপ আজ তার কপালে ফুটে উঠলো না—যেন নিশ্চল উজ্জ্বল মহিমাময়ী দেবী মূর্ত্তি!

বিঃ দ্রঃ—গল্পটি আশুতোষ কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পকার ৺বিভূতিভূষণ ঘোষাল মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সংখ্যায় ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল।

॥ খুঁজোনা আমায় ॥

তপন মুখোপাধ্যায়

আকাশ আলোয় খুঁজোনা আমায়—
শ্মশানের ভস্মস্তূপে মাথা রেখে
নক্ষত্রের ক্রশ আঁকা বুকখানা বসে বসে দেখো ;
বিষাদ-কফিনে শুয়ে শুয়ে ঘুমের হৃদয়ে
তুহিন হিমের অশ্রু মেখো শুধু ;
এস্কিমোর দেশে বল্গাদের মত মাঝে মাঝে
কাল্পনিক পাখী হয়ে এক—ঘুরে ঘুরে দেখো—
এক জীবন—এক স্তূপ কাঁদনের শুধু—
কবরের বুক-থেকে-ওঠা রাশি রাশি মৃতদের শ্মশানে এইখানে।

সেইখানে বসে বসে ঘুমের প্রহরে
গান গাব আমি—শ্রাবণের ঢলনামা গান—
বুকের গভীর পাঁজরে এক মাইকেল ব্যথার ক্রান্তিকালে
কাঁদনের ঝড়ে অসহ্য যন্ত্রণায় সিক্ত ; ফিকে রক্তভরা বুকে
ক্যারিজিও মনে সমুদ্রের কাছে নীল খুঁজে হতাশ বেদনায়
দেউল মনের অংগনে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে
অশ্রুর স্বাক্ষর রেখে যাব ধূলোদের পায়

অবশেষে বিষাক্ত বিদায়ের ঈশারায় খুঁজোনা আমায়—।

নিউরোসিসের উৎস সন্ধানে

মন্টুকুমার মিত্র

মনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেন আত্মার সঙ্গে দেহের সম্পর্ক। আত্মাহীন দেহের কথা আমরা যেমন চিন্তা করতে পারি না, তেমনি মনহীন মানুষের কথাও আমরা চিন্তা করতে পারি না। ব্যক্তিজীবন তথা সমাজজীবনে এই মনের ভূমিকা বিরাট।

বর্তমান পৃথিবীর পশ্চিম ইউরোপ, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় ক্রমবর্ধমান মনরোগীর সংখ্যা দেখা যাচ্ছে। এমনকি ভারতবর্ষেও এই রোগের ক্রমপ্রসার দেখা যাচ্ছে। মনোরোগের ইংরাজী প্রতিশব্দ Neurosis (নিউরোসিস)। এখন প্রশ্ন হলো এই নিউরোসিস কেন হয়? আর এর উৎসই বা কি? নিউরোসিস যে কেন হয় ও তার উৎসই বা কি এ সম্বন্ধে বহু ভাববাদী গবেষণামূলক আলোচনা হয়েছে, যথার্থ বৈজ্ঞানিক আলোচনা একবারই হয়েছে, পাভলভ করেছেন, আর বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে তাঁর মতাবলম্বীর সংখ্যা খুব কম নয়।

আমি প্রথমে ভাববাদী অলোচনাগুলি করবো এবং পাভলভীয় পদ্ধতিতে দেখাতে চেষ্টা করবো যে সেই আলোচনাগুলি নিউরোসিসের উৎস সন্ধানে যথার্থ হয়নি।

ফ্রয়েড (Freud) বলেন, মানুষের সহজাত ও অপরিবর্তনীয় প্রবৃত্তি হলো কাম। এই কামের অচরিতার্থতাই হলো নিউরোসিসের উৎস। তাঁর মতে মনরোগের কারণ মানসিক দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্ব প্রাণধর্মের সাথে জড়ধর্মের। পরবর্তীকালে তিনি আরও বলেছেন যে নির্জ্ঞান মন উদ্ভূত জৈবিক প্রবৃত্তির সাথে সামাজিক বিধিনিষেধের পারস্পরিক সংঘাত থেকে যে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, সেই মানসিক দ্বন্দ্বই সৃষ্টি করে মনোরোগের। ফ্রয়েডের মতে প্রবৃত্তি অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত। তাই দ্বন্দ্বও চিরকালীন। আর সেই দ্বন্দ্বের যা অবশ্যম্ভাবী ফল নিউরোসিস—তাও চিরকাল থাকবে। অর্থাৎ নিউরোটিক (Neurotic) রোগী থাকবেই। আবার তাঁর 'Civilisation and its Discontents' গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে সভ্যতাই নিউরোসিসের উৎস এবং সভ্যতার উন্নতি বা প্রগতি মানে নিউরোটিক রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি। নিউরোসিসের প্রতিষেধক সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি চুপ। তিনি মনে করেন, যা মনোরাজ্যের ব্যাপার তার কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থার সৃষ্টি হতে পারে না।

হর্ণি (Harney) কথা পালটালেও সুর পালটালেন না। অর্থাৎ ফ্রয়েডের সাথে হর্ণির মিল ভাবের দিক থেকে, পার্থক্য যা তা শুধু কথার দিক থেকে। হর্ণি

বললেন—"The combination of many adverse environmental influences produces disturbances in the childi's relation to self and others. The immediate effect is what I have called the basic anxiety, which is a collective term for a feeling of intrinsic weakness and helplessness toward a world perceived as potentially hostile and dangerous. The basic anxiety renders it necessary to search for ways in which to cope with life safely. The ways that are chosen are those which under those given conditions are accessible. These ways, which I call the neurotic trends acquires a compalsory character ('New Ways-in Psycho-analysis' Kegan Paul, London)

হর্ণির এই উক্তিটা বিজ্ঞানসম্মতির দিকে আঙ্গুলি সংকেত করলেও ভাববাদের পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে। কারণ শৈশবের প্রতিকূল পরিবেশ ও সেই পরিবেশজাত যে ভয়, উদ্বেগ, সংশয়, তাই হলো নিউরোসিসের উৎস। হর্ণির কথায় আরও একটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হবে যে নিউরোসিস হলো এই উদ্বেগ বা আশঙ্কা থেকে মুক্তি পাবার সহজ উপায়।

নিও-ফ্রয়েডিয়ান নাম নিয়ে একদল নতুন ভাববাদী বললেন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি, অনেক ত্রুটি আছে। প্রকৃত পক্ষে সেই অসঙ্গতি ও ত্রুটিগুলিই নিউরোসিসের উৎস।

এবারে ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে পাভলভ ও তাঁর মতাবলম্বীদের বক্তব্য হলো যে তাঁর আলোচনা ভাববাদী, বিজ্ঞানবাদী নয়। তিনি বলেছেন মনরোগ মানসিক দ্বন্দ্বের ফল। এখানে পাভলভের জিজ্ঞাস্য মানসদ্বন্দ্বের সৃষ্টি কি আপনি আপনিই হয়, না সেই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি সামাজিক দ্বন্দ্ব উদ্ভবের অপেক্ষা রাখে? নিশ্চয় মানসদ্বন্দ্ব সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। এখানে ফ্রয়েড তাঁর থিওরি অনুযায়ী বলতে পারেন যে মানসিক দ্বন্দ্ব সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন কেন হতে যাবে? মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি নির্জ্ঞান মন থেকে। এখানে পাভলভের প্রশ্ন নির্জ্ঞান মন কি? তার কি কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়? যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহলে ফ্রয়েডীয় তথ্যকে মেনে নিতে পাভলভের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি তা না পাওয়া যায় তবে ফ্রয়েডের ভাববাদী ঘোলাটে কথা তিনি শুনতে রাজী নন। ফ্রয়েড বলেছেন আদিম, অপরিবর্তনীয় ও আত্যন্তিক মৌনতাই নিউরোসিসের কারণ। একথা বিজ্ঞানপন্থীরা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন, যে সমাজ ব্যবস্থায় শোষণধর্মিতা নেই, জীবনযাত্রার মান উন্নত, শিক্ষার প্রসার আছে, নারী

ও পুরুষের সমান অধিকার ও নারীর হীনমন্যতা নেই, সেই সমাজব্যবস্থার যৌনতার মধ্যে আদিমতাও থাকবেনা, অপরিবর্তনীয়তা থাকবে না এবং যৌনসংঘাত থেকে নিউরোসিসের সৃষ্টিও হবে না।

এবারে হর্ণির প্রসঙ্গে আসা যাক। বিজ্ঞানবাদী গবেষকরা মনে করেন না যে শৈশবের সামাজিক প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিউরোসিসের সৃষ্টি। শৈশবে শিশু যে প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হয়, যৌবনে সেই প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি নাও হতে পারে। বরং বয়সের সাথে সাথে মনের যতই বিকাশ ঘটবে, ততই উদ্বেগ, সংশয় স্নেহ-প্রেম-ভালবাসায় পরিণত হবে। শিশুর মনে একবার উদ্বেগ-আশঙ্কা ঢুকলে তা চিরকালের মত শিশুকে নিউরোটিকে পরিণত করবে বিজ্ঞানবাদীরা তা বিশ্বাস করেন না। পরিবেশের পরিবর্তন আছে। আর সেই পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য আছে মানুষের গুরুমস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রনাধীন Conditioned Reflex বা সর্তাধীন পরাবর্ত। এই Conditioned Reflex-এর জন্যেই মানুষ অতীতের পরিবেশকে সহজেই ত্যাগ করে নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

নিও-ফ্রয়েডীয়ানরা বিজ্ঞানসম্মতির কাছাকাছি গিয়েও আবার ফিরে গেছেন ফ্রয়েডের ভাবছন্দজীবনে। সমাজ ব্যবস্থায় অসঙ্গতি কোথায়, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির কি সম্পর্ক। একে অপরের নির্ভরশীল কিনা সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেননি নিও-ফ্রয়েডীয়ানরা। তাই বিজ্ঞান এঁদের কথার যথার্থ মর্যাদা দিতে অক্ষম।

নিউরোসিসের উৎস সম্বন্ধে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা প্রথম করলেন আইভান পেত্রোভিচ পাভলভ। তিনি বললেন-ভাববাদীরা বলছেন যে শৈশবে শিশুরা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে নিউরোটিকে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু এই প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে কেন? তারপর তিনি বললেন ফ্রয়েড বলেছেন যে শিশুর নির্জ্ঞান সমাকাঙ্খার পথে বাবা-মা যে বিধিনিষেধের আরোপ করছেন এবং অন্যান্য কারণে শিশুর প্রতি হৃদয়হীনের মত ব্যবহার করছেন তার ফলে নিউরোসিসের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এই পারিবারিক অসুস্থতার কারণ কি! কোথায় এর উৎস?

পাভলভ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে বললেন যে, নিউরোসিসের উৎস হলো শোষনধর্মী ও প্রতিযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থা। তিনি বললেন যে সমাজ ব্যবস্থায়

The rich man in his castle
And the poor man at his gale

সেই সমাজ ব্যবস্থাই নিউরোসিসের জনক। তিনি বললেন যে সমাজব্যবস্থায় আছে শ্রেণীবৈষম্য, আছে উৎপাদন সম্পর্ককে কেন্দ্র করে উৎপাদন শক্তির সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব,—যার প্রতিফলন মনে, আছে সংখ্যালঘু ধনিকশ্রেণীর অত্যধিক মুনাফা ও বিশাল সংখ্যক শ্রমিক সাধারণের চোখের জল, সেই সমাজ ব্যবস্থাই নিউরোসিসের উৎস। যে সমাজ ব্যবস্থায় বিশাল সংখ্যক জনসাধারণ আর্থিক ক্লেশ ভোগ করে, শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হয়, সবায়ের সাথে ভাবের আদান-প্রদান থেকে বঞ্চিত হয়, যে সমাজব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের স্নেহ, প্রীতি ভালবাসার সহজ সম্পর্ক, সহজ মেলা-মেশার সুযোগ ঘটে না, সেই সমাজ ব্যবস্থাই নিউরোসিসের জন্মদাতা।

পাভলভ বললেন, Conditioned Reflex এর নিয়ন্ত্রণ কর্তা গুরুমস্তিষ্কের উপরি-ভাগ। এই Conditioned Reflex এর সাহায্যেই মানুষ নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কিন্তু উচ্চ মস্তিষ্কের সামনে এমনও সর্ত আসতে পারে যে সর্ত অনুযায়ী নতুন Reflex গড়া উচ্চ মস্তিষ্কের পক্ষে সম্ভব নয়। অসঙ্গত, অস্বাস্থ্যকর ও ত্রুটিপূর্ণ পরিবেশ ও সমাজব্যবস্থার চাপে উচ্চমস্তিষ্কের ওপর বেশী দিন ধরে আঘাত করলে উচ্চমস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র ভেঙে যেতে পারে। আর তার ফলেই ঘটতে পারে উচ্চমস্তিষ্কের বিফলতাজনিত অসুস্থতার সৃষ্টি। আর এই অসুস্থতা দীর্ঘদিন ধরে থাকলে নিউরোসিস অবশ্যম্ভাবী।

এখনো তো বেঁচে আছি

কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

এখনো তো বেঁচে আছি আমি
সফল শরীর আর
কল্পনার স্বাদ নিয়ে মনে।

অথচ দারুণ ঝড়ে
হয়েছি অস্থির—
গৃহ থেকে উৎখাত
অনেক সময় ;
গভীর কান্নার স্বর শুনে
ভেঙে পড়েছে হৃদয়।

মানুষের আর্তনাদ শুনে শুনে
আমি যেন হিম হয়ে গেছি—
কখনো বা ভেবেছি সভয়ে ঃ
জীবনের স্রোত সব
স্তব্ধ হবে আগামী দিনেই।

শঙ্কিত বন-ঝোপঝাড়
অন্ধকার তবু
পার হয়ে এসেছি আলোয়—
হয় তো বা আগামী জীবনে
যাবো কোন উজ্জ্বল
আলোর সন্ধানে।

এখনো তো বেঁচে আছি আমি—
মানুষের সুপ্রাচীন বার্তা নিয়ে মনে।
দেখো ঠিক জেগে থাকবো
আগামী দিনেও।

গ্রন্থ সমালোচনা

বঙ্গ সাহিত্যের—প্রাচীন পর্ব ঃ তারাপদ ভট্টাচার্য

এস, গুপ্ত ব্রাদার্স প্রাঃ লিঃ। ৫৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

মূল্য—আট টাকা।

বঙ্গ সাহিত্যের বিদগ্ধ অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য লিখিত 'বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস-প্রাচীনপর্ব' বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি নূতন পথের নির্দেশক। বিশ্বের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় নানা মত ও পথ নির্দেশিত হইয়াছে এবং এই মত ও পথ লইয়া বিতর্কও কম হয় নাই। বিতর্ক স্বাস্থ্যের লক্ষণ, কিন্তু বিতর্ক বিতর্কই থাকিয়া যায় যদি সেই বিতর্কের মধ্যে সৃষ্টির তাগিদ না থাকে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় আজ পর্যন্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি মামুলী পথ অর্থাৎ যাহাকে বলা হয় গ্রন্থবার্ত্তা তাহাই অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল। অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্য সেই গতানুগতিক পথে অগ্রসর হন নাই দেখিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই। তিনি রসিকের দৃষ্টি লইয়া বলিষ্ঠ প্রকাশ ভঙ্গীতে ও সাবলীল ভাষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তথ্য ও যুক্তি দ্বারা নিজের ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য। বাগীশ্বরী অধ্যাপক ডঃ নীহার রঞ্জন রায় যথার্থই বলিয়াছেন, "বহুদিন পরে যথার্থ একখানা সাহিত্যের ইতিহাস পড়বার সুযোগ হ'লো। আগাগোড়া তারাপদ বাবুর দৃষ্টি সাহিত্য বোদ্ধা ও রসিকের দৃষ্টি। .....অবান্তর তথ্য ও তত্ত্বে গ্রন্থটি ভারাক্রান্ত নয়, আর যে সব সাহিত্য গ্রন্থ লেখক আলোচনা করেছেন তাদের মূল্যায়ণ যথাযথ হয়েছে।"

রসিক সমালোচকের দৃষ্টিতে রামতনু অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও গ্রন্থটির যথার্থ মূল্যায়ণ করিয়াছেন, "গ্রন্থখানির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল লেখকের দৃষ্টি স্বাতন্ত্র্য ও মত স্বাতন্ত্র্য। .....তাঁহার মতামতকে তিনি যে প্রণিধানযোগ্য করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন সাহিত্যালোচনায় এইখানেই তাঁহার সফলতা। জ্ঞাত তথ্য সম্বন্ধে নূতন সমীক্ষা ও নূতন আলোকপাতই তাঁহার লক্ষ্য।"

অধ্যাপক শ্রী ভট্টাচার্যের বলিষ্ঠ প্রকাশ ভঙ্গীতে নিজের মতামত প্রকাশের অপরিসীম সাহস দেখিয়া যেমনই মুগ্ধ হইয়াছি, তেমনই বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় নবীনের আগমনের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি। অধ্যাপক শ্রী ভট্টাচার্যের প্রদর্শিত সাহসকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের যথার্থ মূল্যায়ণ হউক—ইহাই আমাদের আশা। বঙ্গসাহিত্যানুরাগীরা অধ্যাপক শ্রী ভট্টাচার্যের 'বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে'র পরবর্ত্তী খণ্ডের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষায় আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

উপসংহারে কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের উক্তি উদ্ধৃতি করিয়া বলিতে চাই, অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্যের 'বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস' সাহিত্যের মামুলী ইতিহাস নয়, ইহা রসজ্ঞের যুক্তিগর্ভ সাহিত্য-বিচার। .....এই গ্রন্থে লেখকের নির্ভীক সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রচলিত দায়িত্বশূন্য মতামতগুলির বিচার বিশ্লেষণ করিয়া যথাযথ পক্ষপাতশূন্য মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন।"

—সত্যরঞ্জন বসু

রবীন্দ্রনাথের বলাকা ঃ শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

শান্তি লাইব্রেরী, কলিকাতা-৯

মূল্য ৪·৫০ ন. প. মাত্র।

প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপক নামে যাঁরা খ্যাত, তাঁরা মুখ্যতঃ গ্রন্থকার, গৌণতঃ অধ্যাপক। অর্থাৎ তাঁদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি গ্রন্থরচনার দ্বারা, অধ্যাপনার দ্বারা নয়। শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় তার ব্যতিক্রম। তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি অধ্যাপক এবং পরে তিনি গ্রন্থকার। ফলে তাঁর গ্রন্থরচনার প্রণালী ও আঙ্গিক গতানুগতিক পথে নয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠে এই ধারণাই আরও সুদৃঢ় হবে যে পূর্ববর্তী আলোচনা-গ্রন্থগুলির মতই বর্তমান গ্রন্থখানিতে রবীন্দ্রনাথের বলাকার গতানুগতিক সমালোচনা আমরা পাইনা। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় "বলাকা কাব্য" পাঠ করেছেন এবং আমরা তা রসিয়ে রসিয়ে আস্বাদ করছি। এটাই কাব্যগ্রন্থ বিচারের অভিনবত্ব ও মৌলিকতা।

'বলাকা' সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক যে সব মত প্রকাশ করেছেন, যে সব প্রশ্ন

তুলেছেন, শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় কোনটিকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেননি। সমস্ত মতগুলি বিচার করে নিজের মতো করে তিনি বলাকার কবিতাগুলি আস্বাদ করেছেন।

অমিয়বাবু বলেছেন, 'বলাকা' কাব্য নবীনতত্ত্বের রসশিল্প। নূতন ও নবীনের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তিনি। 'বলাকা' সম্পর্কে বলা হয় বলাকা গতির কাব্য। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, "রবীন্দ্রনাথের গতির একটি বিশেষ অধ্যাত্মবাণী আছে। সেই বাণীটিকে একটি মাত্র শব্দে ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হয় 'প্রেম'। এ প্রেম একাধারে অদ্বৈত ও দ্বৈততত্ত্ব—একদিকে নিত্য স্থির, অপরদিকে অস্থির চঞ্চল। রবীন্দ্র শাস্ত্রে প্রেম-ই গতি, প্রেমই গন্তব্য।"

বলাকার কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি এই তত্ত্বটিকে সপ্রমাণ শুধু করেননি রমনীয় ভঙ্গীতে তা' বলেছেন বলে' আমরা যেন শ্রোতা হয়ে তা আস্বাদ করেছি। বলেছেন তিনি, রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্বে সেই সুন্দর ও মঙ্গলের চেতনাটি যাঁরা লক্ষ্য করবেন, তারাই বলাকা কাব্যের স্পষ্টার্থ থেকে ব্যঞ্জনার্থে প্রবেশ করবেন, যুগভাবনার কালসীমা থেকে যুগোত্তীর্ণ মহাভাবের কালাতীত সৌন্দর্যে প্রবেশ করবেন।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় নিজে কবি বলে' কাব্যালোচনা আরও রমণীয় হয়ে উঠেছে 'বলাকা' কাব্যের আলোচনা গদ্যকাব্য হয়ে উঠেছে—এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। তিনি তাঁর আলোচনাকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন—নবীন, যৌবন, গতি, গান, প্রেম, ছন্দ, ছবি ও পরিশিষ্ট। প্রথম পাঁচটি পরিচ্ছেদে নামকরণের মধ্যেই তাঁর আলোচনার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়।

বলাকা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে অনেক সত্য, কিন্তু এমন নিরাসক্ত ভঙ্গিতে মহাকবির কাব্যাস্বাদ এমন মনোরম ভাবে আর কেউ করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। আবার বলি, 'বলাকা' আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় নিজের কবিমন নিয়ে এই আলোচনা-গ্রন্থখানিকে কাব্যের মতই লোভনীয় রসবস্তু করে তুলেছেন, এটা সমালোচক হিসেবে শুধু কৃতিত্ব নয়, সমালোচনার আঙ্গিক হিসেবে অভিনব। আমরা অধীর আগ্রহে তাঁর পরবর্তী রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা গ্রন্থগুলির প্রতীক্ষায় রইলাম।

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যাদু-কাহিনী ঃ অজিতকৃষ্ণ বসু

প্রকাশক : ডি মেহরা, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী।
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।
দাম : আট টাকা।

বাংলা সাহিত্যে অ-কৃ-ব নামের পিছনে শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসুকে নতুন করে পরিচিত করার প্রয়োজন নেই। ব্যঙ্গ ও কৌতুক রস পরিবেশন করে বাংলা সাহিত্যের আসরে বর্ত্তমানে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন ইনি তাঁদের অন্যতম। কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হিসাবেও সমান যশের অধিকারী ইনি। সাহিত্যের কোঠায় তিনি বর্ত্তমানে যে গ্রন্থখানি তালিকাভুক্ত করলেন ভারতীয় ভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থ সর্বপ্রথম স্থানটির দাবী রাখে।

যাদুর কাহিনীই দুনিয়ার সবচেয়ে পুরোন আর বিস্ময়কর কাহিনী। এই রহস্য-লোকটির উদ্ঘাটনে যুগযুগ পরিক্রমা। দুনিয়ার সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর ঈশ্বর, এই ঈশ্বরসৃষ্ট বিস্ময়কে কাটিয়ে মানুষের সৃষ্ট বিস্ময়ে মানুষ এখন মুগ্ধ। রহস্যকে উদ্ঘাটন করলে বিস্ময়ের আনন্দটুকু অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে কিন্তু 'যাদু-কাহিনী' সেই রহস্য উদ্ঘাটনের চাবি নয় বরং লেখকের উক্তিতে বলা চলে "যাদুশিল্পের আড়ালে শিল্পীর অন্তরঙ্গ মানবিক পরিচয় পেতে এবং দিতে আমার আগ্রহের অন্ত নেই।" 'যাদু-কাহিনী'র প্রতিটি কাহিনী লেখকের আন্তরিকতার ছোঁয়ায়, যাদু জগতের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। লেখক 'যাদু-কাহিনী'র মধ্যে যাঁদের যাদু জীবন থেকে কাহিনীকে ছেঁকে নিয়েছেন তাঁরা ভারতীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নন সাগরপারের যাদু-কাহিনীও এই গ্রন্থের মধ্যে একসূত্রে গাঁথা।

যাদুকরের জীবনে কেবল যাদুর খেলাই সব নয়, কোনটি আসল কে বলবে? "যাদুকর আমি? না অন্য আমি?" আরও আছে "মানুষের বানানো কাহিনীর চাইতে বিধাতার ঘটানো ঘটনা কত বেশী বিচিত্র, ফিক্‌শনের চাইতে ট্রুথ কতো বেশী ষ্ট্রেঞ্জ।" এমনি সব চিন্তার কথা 'যাদু-কাহিনী' গুলির অন্তরে ছড়িয়ে আছে।

যাদুর গল্প আকর্ষণীয় একথা স্বীকার করতে হয়, এই আকর্ষণীয় বস্তুকে লেখকের সহৃদয় সাবলীল, সরল প্রকাশ ভঙ্গিমায় অন্তরের আরো কাছে এনে দেয়। এক কথায় বইটি পড়তে ক্লান্তি তো নয়ই, আগ্রহ ও আনন্দের উদ্রেক করে। আমাদের হাতে এমন একখানি গ্রন্থ তুলে দেওয়ার জন্য লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ। সবশেষে গ্রন্থখানির প্রচ্ছদপটের উল্লেখ করতে হয়। প্রচ্ছদ শিল্পী নরেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে প্রশংসার দাবী রাখেন।

—সত্যরঞ্জন বসু

মহাক্ষুধা ঃ মন্টু গংগোপাধ্যায়

গ্রন্থপীঠ ২০৯, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬ দাম ছ' টাকা।

বস্তুনিষ্ঠ চেতনার সংগে হৃদয়ের মার্মিকরূপের মিশ্রণ জীবনের ক্ষেত্রে কতদূর পর্যন্ত এসে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে নাট্যকার মন্টু গংগোপাধ্যায়ের উপলব্ধ সত্যের মধ্যে এটি একটি। এই নোতুন সত্যটি তাঁর নবপ্রকাশিত নাটক 'মহাক্ষুধা'য় ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে। 'আর্তনাদ' নাটকে তাঁর যে প্রতিশ্রুতির দৃঢ় পদক্ষেপ দেখেছি মহাক্ষুধায় তার আয়োজন ব্যাপক এবং বিস্তৃত। অনাবশ্যক জটিলতা অবশ্যই সেই পদসঞ্চারণকে ব্যাহত করতে পারেনি এবং পারেনি বলেই সমস্ত নাট্য আয়োজন পরিপূর্ণ অস্তিত্ব পূর্ণাংগ হয়ে উঠেছে। অথচ এনাটকে নাট্যকার বস্তুচেতনা থেকে হৃদয় দৌর্বল্যকে বেশি প্রশ্রয় দিয়াছেন। তথাপি দুই বিপরীতমুখী ভাবধারা মিলেমিশে যা গঠিত হয়েছে, তা নাট্যকারের একান্ত নিজস্ব। সেইজন্য এই দুই উভয়ের সাম্য সম্পর্কে তিনি সাতিশয় সচেতন ছিলেন।

সমাজচিত্র অংকণে তাঁর কৃতিত্ব তিনি আরেকবার প্রমাণিত করলেন। নাটকের প্রাণধর্ম 'objectivity'র যথার্থ প্রকাশে নাটকীয় বস্তুসত্যের সন্ধান দিলেন অতি সহজে। চলমান শতকের দুষ্টগ্রহকে সর্বচক্ষু সম্মুখে প্রসারিত করে নাট্যকার দুর্বিনীত সমাজ সংস্কারের মর্মমূলে আঘাত করেছেন সুকৌশলে।

নাট্যকার অসাধারণ সাফল্যের সংগে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সুদীপ্তের জীবনের আশা, হতাশা, প্রেম, সংকল্প—সমস্তকে ঘিরে রচিত বৃত্তের সমগ্র পরিবেশটাই মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়নে গঠিত। দ্বিতীয় রচিত নাটকে এ ধরণের মানস উত্তরণ খুব অল্প শিল্পীর ক্ষেত্রেই ঘটেছে, এবং আলোচ্য নাটকটি, তথা নাট্যকার মন্টু গংগোপাধ্যায় অতি সহজেই সেই দুরূহ পথে অগ্রসর হয়ে বাঙালি পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। শুধু মাতৃহৃদয়ের উত্থান-পতনই নয়, চিরন্তন অন্যান্য অনেক (যেমন, ডাঃ মুরারী সান্যালের মানসিক বিকৃতি, বলীনের তমসাকীর্ণ প্রেমজাল, দীপ্তির পুত্রকাতরা মন) সমস্যাকে নিয়েও সমাজজীবনের অসহ্য অব্যবস্থা এবং কুটিল ঘৃণিত চক্রান্তকে পুংখানুপুংখরূপে বিবৃত করেছেন সহৃদয়তার সংগে। এই উভয়ের সংযোগে নাট্যকার একাধিক আদর্শ তথা জীবনবোধকে বোধির সম্যক্ ব্যবহারে দৃষ্টিপথে এনেছেন বারংবার। অথচ নাট্যদ্বন্দ্বের মুহূর্তগুলিতে নাট্যকার অসীম ধৈর্যের সংগে পরিচালনা করেও বিমর্ষ (falling action), উপসংহিতি (catastrophe) সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন। নাট্যকারের অনেকগুলি গুণের মধ্যে এটি সর্বপ্রধান।

—সমরেশ মজুমদার

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট লিখতে বসে ভাবছি কি লিখব। কি করতে পেরেছি আর কি করতে পারিনি তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার মত অবকাশেরও অভাব। ছাত্রবন্ধুরা যে গুরুদায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছিল তা যথার্থ ভাবে পালন করতে পেরেছি কিনা তার বিচারের ভার রইল তাদেরই উপর। তবে আমি যা করবার চেষ্টা করেছি তার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি। সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য ইউনিয়নের তরফ থেকে নবাগত ছাত্রদের অভিনন্দন জ্ঞাপক উৎসব। এই উৎসবে নূতন ছাত্রবন্ধুদের কলেজ জীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভ ও বরণ করার জন্যই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন কলেজের মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়। উৎসবে যে উদ্দীপনা ও আবেগের সঞ্চার হয়েছিল তা আমার জীবনে সত্যই এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা হিসাবে সঞ্চিত হয়ে থাকবে চিরকাল।

এ বছরে ইউনিয়নের কাজ শুরু হবার কিছু পরেই ভারতে চীনাদের আক্রমণ শুরু হয়। ফলে আমাদের অনেক ঈপ্সিত কাজ যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা বলাই বহুল্য। তবে এই সময়ে দেশের প্রতিরক্ষা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করতে পেরে আমরা সত্যই ধন্য। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য ছাত্রসংসদ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য আমরা ছাত্রদের নিকট থেকে অর্থসংগ্রহ, ছাত্রদের N. C. C. তে যোগদানে উৎসাহ প্রদান, রক্তদানের জন্য অনুপ্রাণিত করা ইত্যাদি কার্যসূচী গ্রহণ করি এবং অনেকাংশে এই সকল কর্মসূচী সফলতা লাভ করে। দেশের জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এ বৎসরের বসন্তোৎসব স্থগিত রাখা হয় এবং এই উৎসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট ১০০১৲ টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে 'দেশবন্দনা' উৎসব উদযাপিত হয় এবং এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় তাঁর হাতে পূর্বোক্ত ১০০১৲ টাকা এবং ছাত্র ও অধ্যাপকদের তরফ হইতেও অর্থ অর্পণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে ছাত্র ও অধ্যাপকদের মিলিত চীনা আক্রমণের

ASUTOSH COLLEGE FOOTBALL TEAM

Jt. WINNERS OF ELLIOT SHIELD—1962

Standing left :—B. Roychowdhury, B. Debnath, B. Dhali (Capt), B. N. Chakravarti, Prof-in-charge of Football, C. Banerjee, B. Bhattacharjee, Prof-in-charge Hockey, S. Sengupta Games Secretary, S. Samajpati, D. Ganguly, R. Guha, R. Dutta.
Sitting left :—A. Banerjee, B. Banerjee, M. Ganguly, K. Sarkar, A. Hamid, K. De.

ASUTOSH COLLEGE RASAYAN PARISAD—1962-63

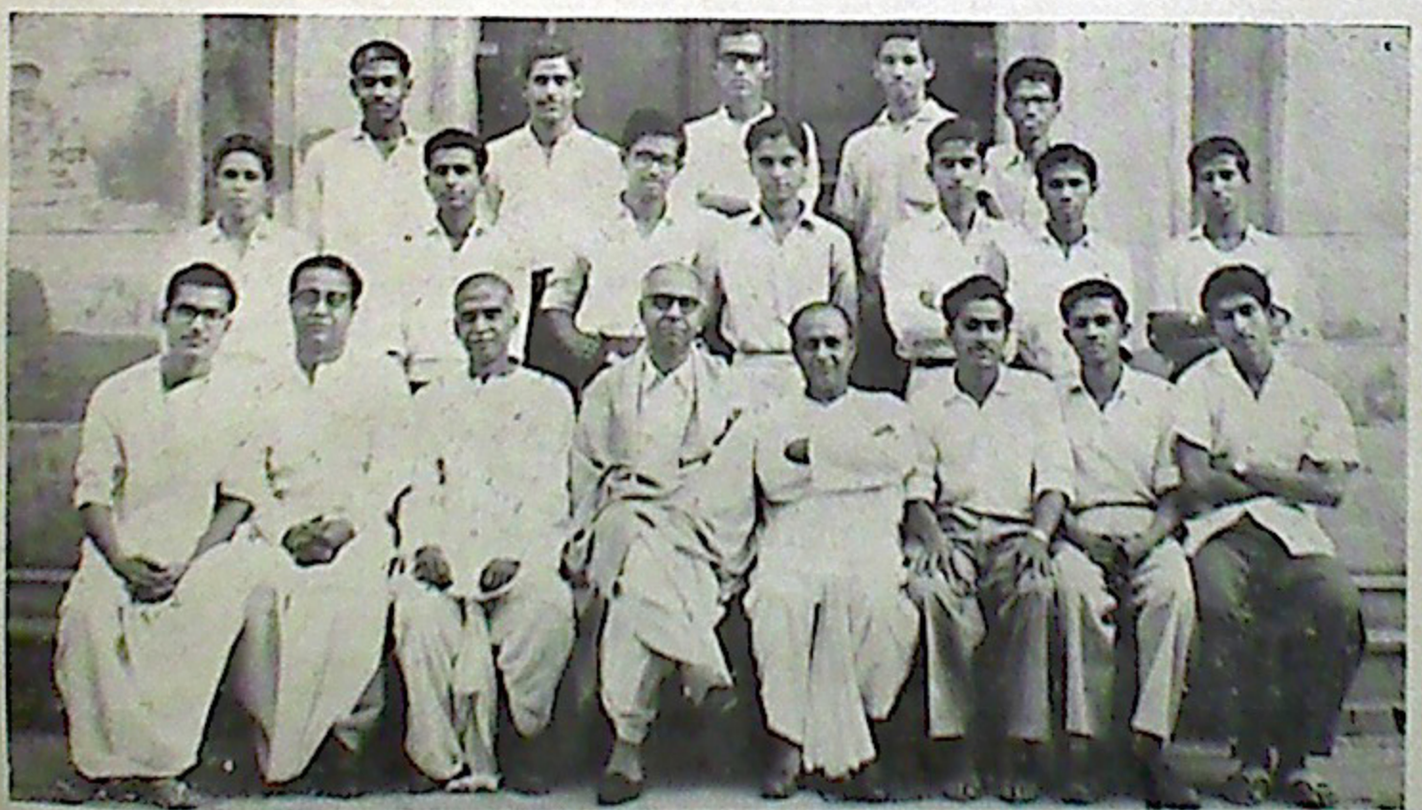

Sitting to the left :—K. Bhowmic (General Secy.), B. N. Chakraborty (President, Students Union) S. Ghosh (President, Rasayan Parisad), K. N. Sen (Principal), N. K. Bhattacharjee (Vice Principal), Subrata Sengupta (Secretary Rasayan Parisad), . Banerjee (Vice President), K. Basu (Festival Secy.)
Staanding to the left (1st row) B. Banerjee (General Secy.), A. Moitra, A Gupta, B. Roychowdhury, G. Chakraborty.
Standing to the left (2nd row)—A. Ghosh, D. Adhikari, S. Mukherjee, S. Majamdar, S. Bose.

ASUTOSH COLLEGE BASKETBALL TEAM—1962-63

WINNER INTER-COLLEGIATE BASKETBALL

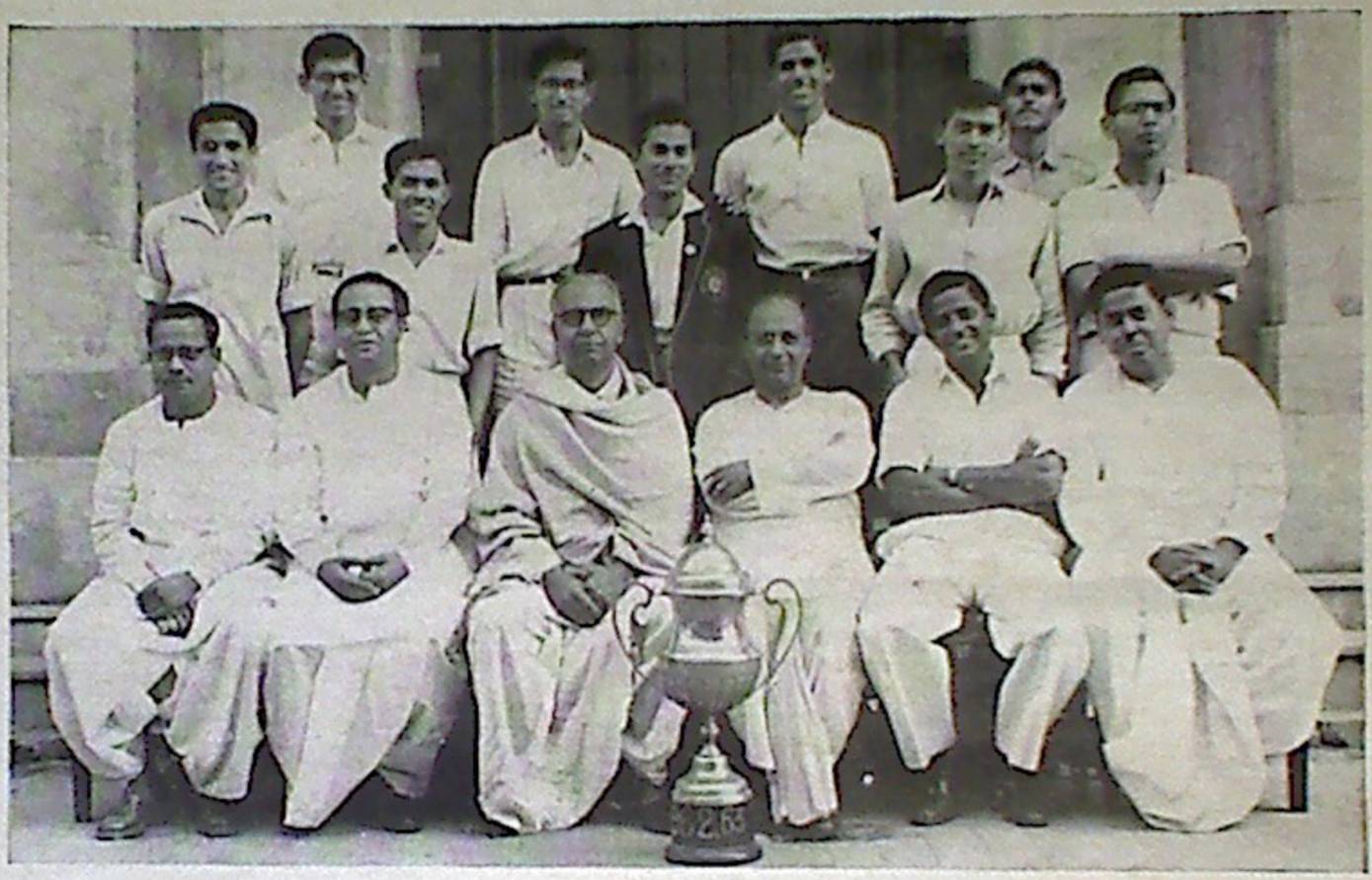

Sitting left :—P. K. Ray (Prof in-charge of Basket ball), B. N. Chakravarty (Prof-in-charge of football), K. N. Sen (Principal), N. K. Bhattacharjee (Vice-Principal), B. Bhattacharjee (Prof in-charge of Hockey), S. P. Banerjee (Prof-in-charge of Sports).

Standing left (*1st row*)—S. Bhattacharjee, B. Banerjee, (Asst. Games Secy.), Subrata Sengupta (Games Secy.), P. Bhowmic, D. Ghosh.

Standing left (*2nd row*)—H. Adhikari, B. Banerjee (General Secy.), D. Adhikari (Capt), Ganu (Mali).

বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ শোভাযাত্রর ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাও উল্লেখযোগ্য এই শোভাযাত্রা চীনা দূতাবাস অভিমুখে যাত্রা করে এবং চীনা আক্রমণের নিন্দা করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এ বৎসর কলেজ ক্যান্টিনের সুপরিচালনার জন্য বিশেষ তদারকের ব্যবস্থা করা হয়। ক্যান্টিনে বেসিন ও অন্যান্য ফার্নিচার বৃদ্ধির দ্বারা উন্নতি সাধন করা হয়।

শ্যামাপ্রসাদ ব্যায়ামাগারের উন্নতির জন্য এবার শতাধিক টাকা ব্যয় করা হয় এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা হয়। বিভিন্ন কাজগুলির জন্য আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে সহযোগিতা লাভ করেছি তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আমার এ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে যে জ্ঞান লাভ করেছি তাতে বুঝেছি যে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষানীতি কত ত্রুটিপূর্ণ। বহু সংখ্যক ছাত্র শিক্ষালাভে ইচ্ছুক হয়েও কলেজে স্থানাভাবে ব্যর্থ মনোরথ নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এই নীতির আমূল পরিবর্তন আবশ্যক।

পরিশেষে ছাত্র সংসদের সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই আমার সহকারী সম্পাদক শ্রীপ্রবীর সেনগুপ্তকে। এদের সহযোগিতা ভিন্ন কোন কাজই হয়ত আমার পক্ষে করা সম্ভব হইত না। ছাত্র সংসদের বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদক, সভ্যদের এবং কলেজের ছাত্র বন্ধুদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

বন্দেমাতরম্ ॥

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
আশুতোষ কলেজ ছাত্রসংসদ।

প্রতিবেদন

রবীন্দ্র পাঠচক্র

"আজ থেকে ষোল বছর আগে অধ্যাপক অমীয়রতন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রথম রবীন্দ্র পাঠচক্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর কত ছাত্র এসেছে গিয়েছে এই পাঠচক্রের মাঝে যাঁরা সাহিত্য সাধনা করেছিলেন তাঁদের অনেকেই আজ আধুনিক সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত।

এ পাঠচক্রের ভার যখন আমরা তুলে নিলাম এ বছরের প্রথম দিকে। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন অধ্যাপক সত্যরঞ্জন বসু মহাশয়কে। আজকের পাঠচক্রের সমস্ত কৃতিত্বটুকু তারই প্রাপ্য। প্রথম কাজ শুরু করেছিলাম লিপিকা প্রাচীরপত্রের মাধ্যমে। সম্পাদনার ভার নিয়েছিল বরুণ চক্রবর্তী ও জয়ন্ত রায়। প্রাচীরপত্রের মোট চারটি সংখ্যা প্রকাশ হয়েছে অঙ্কন ও অন্যান্য কারুকার্যের ভার সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করেছেন ইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়।

ইউনিয়নের সঙ্গে এবার আমাদের সম্পর্ক ছিল মধুর। ওদের কাছ থেকে আমরা মোট ২২৫৲ টাকা সাহায্য পেয়েছি যা রবীন্দ্র পাঠচক্রের ইতিহাসে কখনো পাওয়া যায় নি। এর জন্য ইউনিয়ন সম্পাদক বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউনিয়ন সভাপতি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও আমাদের সভাপতি সত্যরঞ্জন বসুর কাছে পাঠচক্র কৃতজ্ঞ থাকবে।

বিগত ২২শে নভেম্বর কলেজ হলে আমরা পাঠচক্রের একটি অনুষ্ঠান করি। এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেন এবং বক্তৃতা করেছিলেন প্রখ্যাত নাট্যবিদ্ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও কবি দিনেশ দাশ মহাশয়। এই সভায় পাঠচক্রের পক্ষ থেকে ভারতের প্রতিরক্ষা তহবিলে মোট ১০১৲ টাকা অধ্যক্ষ মহাশয়ের হাতে দান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পী সংগীত পরিবেশন করায় অনুষ্ঠানটি বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

পরিশেষে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পাঠচক্রের কার্যভার অনেক দেরীতে পাওয়ায় আর কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আশা করি ভবিষ্যতের সম্পাদক পাঠচক্রকে আরও নতুন করে ও আরও সুন্দর করে গড়ে তুলবেন।

সমীর রায় চৌধুরী
সম্পাদক, রবীন্দ্র পাঠচক্র

দর্শন পরিষদ

এবছরটা চলে যাবার পর বুঝতে পারলাম যে সে এসেছিল। দর্শন পরিষদকে নতুন করে গড়বার ইচ্ছে ছিল, বলা বাহুল্য তার অল্পই সফলতার আলো দেখেছে, তবু গত ১৫ই সেপ্টেম্বর '৬২ শনিবারের স্মৃতিটা প্রত্যেকেরই মনে আশার আলো জেলেছিল। ঐ দিন সমস্ত দর্শনের ছাত্ররা মিলিত হয়ে 'সমাজে ধর্মের প্রভাব' এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। আলোচনা চক্রের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কালীপদ বক্সী এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ। প্রধান অতিথির যুক্তিগ্রাহী ভাষণ প্রত্যেকের মনে দাগ কেটেছে। দর্শনের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্ররা ঐ আলোচনায় যোগদান করে। দর্শন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শংকরী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিকতা আর স্নেহধারায় আমি স্নাত। তাঁকে প্রণাম জানাই আর কলেজ ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাই আমার প্রীতি সম্ভাষণ। আগামী ছাত্রদের অভিনন্দন জানাই।

এ বছরের দর্শন পরিষদ :

সভাপতি—অধ্যাপক, শংকরী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহঃ সভাপতি—শ্রীবরুণ চক্রবর্ত্তী

সাধারণ সম্পাদক—ইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহঃ সম্পাদক—শ্রীপার্থ রাহা

২১শে ডিসেম্বর '৬২
আশুতোষ কলেজ

ইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক

রসায়ন পরিষদের বার্ষিক পরীক্ষা

শীত এলো। পাতা ঝরার পালা এবার সুরু। আমাদের কাজও গেল ফুরিয়ে। বার্ষিক হিসাব নিকাশের সময় এখন। বার্ষিক বলতে যা বোঝায় এই বছরের রসায়ন পরিষদের স্থায়িত্ব তা থেকে অনেক কম। অনেক চেষ্টার পর আমরা একদল ছাত্র যে পরিষদ গঠন করেছি—ছমাস মাত্র সময়ে তার কোনও কাজই একরকম করে যেতে পারিনি। অথচ এ পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল— ১। ছাত্রদের সাহায্যে গঠিত রসায়ন পাঠাগার স্থাপন, ২। বার্ষিক রসায়ন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, ৩। রসায়ন বিষয়ে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা, ৪। সাপ্তাহিক প্রাচীর পত্রের প্রকাশ, ৫। শিক্ষামূলক ভ্রমন ব্যবস্থা, ৬। রসায়ন চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ৭। রসায়ন বিষয়ে প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, ৮। প্রাক্তন ছাত্রদের সহিত মিলনোৎসব, ৯। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্মোৎসব পালন, ১০। কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন।

কিছু করিনি বললেও কিছু নিশ্চয়ই করেছি। ছোট একটা হিসেব দি'। প্রথমেই বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আমরা প্রতিনিধি সংগ্রহ করে একটা পরিচালনা সমিতি গঠন করি। তারপর ২৬শে ডিসেম্বর এর উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন উৎসবের সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়। তিনি তার ভাষণে পরিষদের স্থায়িত্ব এবং সম্প্রসারণ কামনা করে আমাদের উৎসাহিত করেন। দেশের সংকটকালীন অবস্থায় জন্য আমরা আমাদের প্রস্তাবিত কার্যসূচির বেশীর অংশ বাতিল করে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদান করি। এরপরই অনার্সের ছাত্রদের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। এই ভ্রমণে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' কর্তৃপক্ষের আতিথেয়তা আমাদের মুগ্ধ করেছে। এ ছাড়া আমরা একটা দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরেছি। আরও অনেক কাজ করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু প্রথমতঃ দেশের প্রয়োজনে, দ্বিতীয়তঃ অর্থাভাবে এবং সময়াভাবে বিশেষ কিছু করা গেল না।

এবার আমাদের যে পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে :— প্রেসিডেন্ট—অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট—উপাধ্যক্ষ নীরদ কুমার ভট্টাচার্য, চেয়ারম্যান—অধ্যাপক শিশির কুমার ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান--বিমান ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক—কল্যাণ কুমার ভৌমিক, উৎসব সম্পাদক—কানাইলাল বসু, শিক্ষাভ্রমণ সম্পাদক—সুব্রত সেনগুপ্ত, অর্থ ও প্রচার সম্পাদক—দীপক অধিকারী, পত্রিকা সম্পাদক—দীপক দত্ত, প্রদর্শনী সম্পাদক—সত্যব্রত দত্ত, প্রতিযোগিতা সম্পাদক—অশোক ব্যানার্জী।

আমাদের যে রসায়ন পরিষদ গঠিত হয়েছে প্রথম বর্ষেই তা কলেজের অন্যতম বৃহৎ সংগঠনে পরিণত হয়েছে। আশা করবো ভবিষ্যতে আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। এই প্রসঙ্গে পরিষদের সকল সহযোগীকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এ ছাড়া ছাত্রসংসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আমাদের যে সহায়তা করেছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

অধ্যক্ষ মহাশয়, উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দ সর্বদাই আমাদের যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তা আমাদের জীবনে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কামনা করি, দেশের সংকট একদিন কাটবে, এই পরিষদ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

শুভেচ্ছান্তে

কল্যাণ কুমার ভৌমিক

সাধারণ সম্পাদক : রসায়ণ পরিষদ

ক্রীড়া সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী

এই গোল!.....ঐ আউট.....! খেলার ধারা বিবরণী দিচ্ছি না। খেলার জগতে প্রবেশ করে এ' বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলছি। বিচিত্র এই ক্রীড়াজগত আনন্দ আর দুঃখে, জয় আর পরাজয়ে কেটে গেছে দায়িত্বের সন্ধিক্ষণ।

প্রথম যখন এ' কাজ হাতে পেলাম, তখন আমাদের Annual Sports সুরু হয়ে গেছে। যাই হোক সেটা শেষপর্যন্ত সফল পরিণতি পেয়েছিল ছাত্রসাধারণের যোগদানে, সহকর্মীদের সাহায্যে এবং অধ্যাপকবৃন্দের সুদৃঢ় হস্তক্ষেপে।

এবার আন্তঃকলেজ বাস্কেট বল্ প্রতিযোগিতায় আমরা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছি। হকি দলও আমাদের শক্তিশালী ছিল। বেশ কয়েক বছর পরে হকিতে আমরা আবার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করি লীগ চ্যাম্পিয়ন হ'য়ে।

এর পরেই যে কাজটা করা গেল তা' হল ফুটবল দল গঠন। এবার আমাদের দলে ছিলেন এস. সমাজপতি, হামিদ, বালু, কে. সরকার, সি. ব্যানার্জী, বি, দেবনাথ, বি, রায়চৌধুরী প্রমুখ প্রখ্যাত খেলোয়াড়গণ। আমরা এ'বছর ইলিয়ট্ শীল্ডের ফাইন্যালে উঠি। কিন্তু আইনগত বাধার জন্য ফাইন্যাল খেলা হয়নি; যদিও একটি প্রদর্শনী খেলায় আমরা অপর পক্ষে ফাইন্যালে উন্নীত সুরেন্দ্রনাথ কলেজকে ৩—১ গোলে পরাজিত করি। দেশের সংকটকালীন অবস্থার জন্য হেরম্ব মৈত্র শীল্ডের খেলা এবার হয়নি; তাই আগের বছর চ্যাম্পিয়ান থাকার জন্য সে শীল্ড আমাদেরই হাতে আছে। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ থেকে সুকুমার সমাজপতি (Capt), বলাই ব্যানার্জী, অনিল ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ ঢালি, রণদেব দত্ত এবং রঞ্জন গুহ বিশ্ববিদ্যালয় দলে স্থান পেয়েছেন।

এবার আমাদের ক্রিকেট দল মোটামুটি শক্তিশালী ছিল। আমাদের ক্রীড়াবিভাগ গঠিত হয়েছিল এঁদের নিয়ে— অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (ফুটবল) অধ্যাপক শঙ্করী বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্রীড়া), অধ্যাপক প্রভাত রায় (রেয়িং ও বাস্কেট বল), অধ্যাপক বিমলেন্দু ভট্টাচার্য্য (হকি) এবং অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী (ক্রিকেট)। উল্লিখিত অধ্যাপকগণের সক্রিয় সহযোগিতা উৎসাহের যে ইঙ্কন জুগিয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আমার সহকর্মী বিমান ব্যানার্জী প্রত্যক্ষভাবে আমাকে যে সহায়তা করেছে তাকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং অন্যান্য বন্ধুরা, যাঁরা আমাকে নানান ভাবে সাহায্য করেছে তাদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

আজ বিদায়ের দুঃখ মেনে নিয়ে আমি এই শুভ কামনাই জানাব যে আমাদের কলেজ আরও গৌরব লাভ করবে। জয়হিন্দ্।

সুব্রত সেনগুপ্ত
ক্রীড়া সম্পাদক।

১৯৬২ সালে বিতর্ক বিভাগের কার্য্যাবলী

বর্ষা শেষ হয়ে এল। সেই সঙ্গে পুরানো ইউনিয়নের কাজ শেষ হল। পুরানো বৎসরের শেষ প্রান্তে বসে গত বৎসর কি করেছি কিনা করেছি তার হিসাব দাখিল করছি। কার্যভার গ্রহণ করার আগে অনেক কিছু করার স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু নানা কারণে অনেক কিছু করে উঠতে পারিনি। বৎসরের প্রথমদিকে বহরমপুর কলেজের উদ্যোগে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমরা অংশ গ্রহণ করি। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে আন্তঃক্লাস বিতর্কের আয়োজন করি। এইখানে চতুর্থ বর্ষের সর্ব্বশ্রী কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, বরুণ চক্রবর্ত্তী এবং দ্বিতীয় বর্ষের দীপক ঘোষ, চতুর্থ বর্ষের সলিল আচার্য যথাক্রমে বিতর্কের সপক্ষে এবং বিপক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করেন। নভেম্বর মাসের ২৮ তারিখে আন্তঃকলেজ বিতর্কের আয়োজন করা হয়, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য ইহা স্থগিত রাখা হয়।

শ্রীতরুণ কুমার গুহ
বিতর্ক সম্পাদক

ষ্টুডেণ্ট এড ফাণ্ড

এবারে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে কর্মভার হাতে পেয়েছি। কাজেই আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছাত্র বন্ধুদের অনেক সুযোগ সুবিধার অপমৃত্যু ঘটিয়েছি বলে প্রথমেই ত্রুটি স্বীকার করছি।

প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় ও চতুর্থ বর্ষের ছাত্র বন্ধুদের যথারীতি ৫০০৲ সাহায্য দিয়েছি প্রতিবারের মত এবারেও সিনেমা শো' করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু স্থানীয় সিনেমা হাউসদের সহযোগিতার অভাবে তা কার্যকরী হয় নি। সারা বছরের বিভিন্ন কর্ম চক্রের আবর্তনে আবর্তিত হয়ে এড ফাণ্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের অত্যাশ্চর্য হৃদয়ের করোষ্ণ স্পর্শ অনুভব করেছি। আজ বিদায় লগ্নের মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁকে প্রণাম করি।

নবাগত এড ফাণ্ড সম্পাদকের প্রতি রইলো আমার শুভেচ্ছা, আশা করি, প্রত্যাশা রাখি আমি যা পারিনি, তিনি তা পারবেন।

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়
ষ্টুডেণ্ট এড ফাণ্ড সম্পাদক।

ছাত্র কমনরুম

কমনরুমে গিয়ে লিখতে বসে ভাবছি কি লিখব। কলেজের ছাত্ররা আমাকে কমনরুম সম্পাদক করে যে গুরুভার অর্পণ করেছে তা যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছি কিনা তার হিসাব নিকাশের ভার কলেজের ছাত্রদের হাতে রইল।

প্রথমতঃ কমনরুমের কাজের ভার এবার দেরীতে পেয়ে কাজ সুরু করি।

কি কি কাজ করতে পেরেছি বা যা চেষ্টা করেছি তার বিবরণ দেওয়া এই একটি লেখার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করা সম্ভব নয়।

তবুও দুচারটি কথা সংক্ষেপে বলে যাব। প্রথমতঃ এবার কাজ হাতে পেয়েই দৈনন্দিন কার্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। দৈনন্দিন কলেজের ছাত্রদের অন্তর্বিভাগীয় ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

এবার আমরা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিট্যুট কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্কলেজিয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের কলেজের ছাত্ররা যথেষ্ট ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

এই বৎসর আমরা সর্ব্ব প্রথম "আন্তঃকলেজীয় টেবিল টেনিস" প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। আনন্দের বিষয় যে এতে আমাদের কলেজ হেরম্বচন্দ্র কলেজকে ফাইন্যালে পরাজিত করে বিজয়ী হয়।

এই বৎসর আমরা সর্ব্বপ্রথম "All India Moinul Huq Table Tennis Tournament'এ বিজয়ী হইয়া কাপ লাভ করি। খেলাটি অনুষ্ঠীত হয় পাটনায়।

তাছাড়া এ বৎসর আমরা কমনরুম থেকে সাহিত্যের প্রবন্ধ, ছোট গল্প, কবিতা, একাংকিকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করি এবং আমাদের কলেজের ছাত্ররা এতে যোগদান করে। যোগ্য ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হয়।

কলেজে বিভিন্ন পত্রিকা আনয়ন, মাসিক, সপ্তাহিক পত্রিকা স্মারকলিপি প্রভৃতি। এবার কমনরুমে ১২০০ শত টাকার বিভিন্ন পুস্তক আনা হয়।

উপরোক্ত কাজগুলি চালিয়ে যেতে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে প্রথমে ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা জানাই অধ্যাপক শ্রীসলিল গাঙ্গুলী মহাশয়কে বিদায়ী অধ্যাপক শ্রীগোপিকানাথ রায় চৌধুরীকে। এছাড়া সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য সম্পাদকদের ও আমার সহকারী কমনরুম সম্পাদককে। সর্বশেষে আন্তরিক শ্রদ্ধানিবেদন করি শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ ও উপধ্যক্ষ মহাশয়কে। তাঁদের মহামূল্য উপদেশ দ্বারা সঠিক পথে পরিচালিত করিবার ও সহযোগিতার জন্য।

কমনরুমের আরও উন্নতির জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আশাকরি আগামী ছাত্রসংসদ ইহা পালন করিবে।

কানাই লাল বসু
কমনরুম সম্পাদক।

আশুতোষ কলেজ নিউ হোষ্টেল

২২, কালীঘাট রোড,

১৯৬২ সাল বিদায় নিল। এল ১৯৬৩ সাল। তাই '৬২ সালে কি করেছি, কি করিনি তার হিসেব মেলাতে বসলুম।

প্রথমেই বলি ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মোৎসব এবং ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের কথা। নেতাজীর জন্মোৎসব উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে পালন করা হয়। ২৬শে জানুয়ারী সকালে আমাদের অধীক্ষক মহাশয় জাতীয়-পতাকা উত্তোলনকরেন। একই-ভাবে স্বাধীনতা দিবস ১৫ই আগষ্ট পালন করেছিলাম আমরা। অন্যান্য বছর যেমন হয় এ বছরও তেমনি সুন্দরভাবে সরস্বতী পূজা করা হয়েছিলো হোষ্টেলে। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় এবং অধ্যাপক মহাশয়রা এসে আমাদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। উৎসবকে করেছিলেন মধুরতর। এপ্রিল মাসে এক ভাবগম্ভীর অনাড়ম্বর পরিবেশে বিদায়ী আবাসিকদের জানিয়েছিলাম সকরুণ বিদায়।

আমাদের আবাসিকদের মধ্যে খেলাধূলা পড়াশুনায়ও উৎসাহের কোন কমতি ছিল না। ফুটবলের দিনে ফুটবল, ক্রিকেটের দিনে ক্রিকেট খেলেছি নিয়মিত। আমাদের কলেজের অপর হোষ্টেলকে প্রীতি ফুটবল খেলায় আমরা পরাজিত করেছিলাম। তবে হারজিতের চেয়ে মিলনের কামাই ছিল লাভ। হোষ্টেলের গেমস্ সেক্রেটারী শ্রীস্বপন হালদারকে ধন্যবাদ জানাই তার যোগ্য নেতৃত্বের জন্যে। পড়াশুনায়ও অবাসিকরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় ও তিন বছর ডিগ্রী কোর্সের (১ম অংশ) পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হলেও বি. এ. ও বি. এস. সি. (পুরনো কোর্স) পরীক্ষায় আবাসিকরা যে ফলাফল দেখিয়েছে তা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এই সুযোগে আমাদের ট্রেব্স্ট বুক লাইব্রেরীর কথা বলে নিই। এইটি আমাদের গৌরবের বস্তু। এ বছরে অনেক মূল্যবান বইয়ের সংযোজন হয়েছে লাইব্রেরীতে। লাইব্রেরীয়ান শ্রীপ্রবীর রায়কে এর জন্যে ধন্যবাদ জানাই।

আমরা হোষ্টেলের আবাসিকরা দেশের সংকটাবস্থা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ সজাগ। নভেম্বর মাসে আমরা মাসিক 'ফীষ্ট' না করে ১০১৲ টাকা দেশের প্রতিরক্ষা সাহায্য ভাণ্ডারে দিই। দেশের এই সংকটকালে দেশমাতার সামান্য সেবা ও অধ্যয়নের মধ্যে করতে পেরেছি বলে আমরা ধন্য। আমাদেরর আবাসিকরা পৃথকভাবেও কলেজের প্রতিরক্ষা সাহায্য ভাণ্ডারে যথাসাধ্য দিয়েছে।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় অধীক্ষক মহাশয়ের সুস্থ নীরোগ দীর্ঘজীবন কামনা করি। তাঁর মূল্যবান উপদেশাবলী আমাদের নানাবিষয়ে উৎসাহ দিয়েছে। তিনি তাঁর কর্মব্যস্ত দিনগুলির মধ্যেও আমাদের জন্য সময় করে নিয়ে খেলাধূলায় ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আমাদেরে উৎসাহ দিয়েছেন।

নতুন বছরে হোষ্টেল-জীবন মধুরতর হোক্ এই কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। শুভেচ্ছা জানাই।

করুণা কয়াল
সাধারণ সম্পাদক

আশুতোষ কলেজ ছাত্রাবাস

১৬, বসন্ত বসু রোড, কলকাতা—২৬

॥ বার্ষিক বিবরণী ॥

দেখতে দেখতে আরও একটি বছর অতিক্রান্ত হ'ল ছাত্রাবাসের জীবনে। আলোকাভিসারী আটচল্লিশটি তরুণ মন জীবনের সাথে আরও একটু নিবিড় হবার সুযোগ পেল।

বিগত বছরের স্মৃতিচারণ করতে গেলেই হৃদয়ে খচ্ করে বিঁধে ওঠে একটি বেদনার কাঁটা—দেশের আজ রাজনৈতিক বিপর্যয়। মাতৃভূমির এই বিপর্যয়ে আমাদের বীণায় ধ্বনিত হয়েছে একটি সঙ্কল্পের সুর সে সঙ্কল্প স্বাধীনতা রক্ষার। আমরা আমাদের বাৎসরিক বনভোজন বন্ধ করে তার জন্য বরাদ্দ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছি। সুযোগ পেলে রক্ত এবং কর্মদান করতেও আমরা উৎসুক। আগামী সরস্বতী পূজাতে সর্বপ্রকার আড়ম্বর বর্জন করে উদ্বৃত্ত অর্থ প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে জমা দেবার অভিপ্রায়ও আমাদের আছে।

এ বছর ছাত্রাবাসের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ। স্নাতক পরীক্ষার কলাবিভাগে সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিদায়ী ছাত্রদের সাথে মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত করার ইচ্ছা আমাদের ছিল কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে আমাদের অপর ছাত্রবাসের সাথে (কালীঘাট রোড) এক স্মরণীয় মিলোনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসও আমরা উৎযাপন করেছি। তাছাড়া আমরা একটি সাহিত্য পত্রিকা ছাত্রাবাস থেকে প্রকাশ করছি।

আমাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে শ্রদ্ধেয় অধীক্ষক মহাশয়ের যে সচেতনতা, প্রতিটি ছাত্রের প্রতি তাঁর যে স্নেহ মমতা তাতে শুধু অভিভূত হতে হয়। শুভাকাঙ্ক্ষীর সে স্নেহ শুধু শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা দিয়ে মুছে দেওয়ার নয় তা হৃদয়ের মনিকোঠায় সঞ্চয় করে রাখার মত।

ছাত্রাধিনায়ক শ্রীতাপস দাসগুপ্ত এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপক কুমার দাস তাঁদের কর্তব্য নিষ্ঠাসহকারে পালন করেছেন। এ জন্যে তারা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদাহ।

আমাদের জীবনে না পাওয়ার বেদনা নয়, পাওয়ার আনন্দটাই সত্য, তাই ধ্রুব। তাকে নমস্কার। যা পাইনি তা সঞ্চিত হইল আমাদের উত্তরসূরীদের জন্যে। আমাদের না পাওয়া তাদের পাওয়ার মধ্যে বিকশিত হোক এই বাসনা নিয়েই শেষ করেছি।

শ্রীমনোরঞ্জন রায়

কমনরুম সম্পাদক।

Asutosh College Magazine

Professor-in-Charge

SHRI SATYARANJAN BASU

Editor

SHRI BARUNKUMAR CHAKRABORTY

1962 VOL. XXXVII

List of Editors

1924-1962

Prof. Mohini Mohan Mukherjee (1924) ; Basudev Banerjee (1925) ; Bibhas Roy Choudhury and S. Raghavachari (1926) ; Subodh Biswas, Dhiren Lahiri and Satiranjan Banerjee (1927) ; Sasi Bhusan Barik and Kalyan Kumar Sengupta (1928) ; Asoke Kumar Banerjee and Shyamapada Mukherjee (1929) ; Prabhat Kumar Bose and Kausik Kumar Mitra (1930) ; Shyamapada Mukherjee and Prafulla Kumar Sarkar (1931) ; Amiya Ratan Mukherjee, Bireswar Chatterjee and Batto Krishto Banerjee (1932) ; Hari Prasanna Chakravarty and Prabhat Sen (1933) ; Govinda Roy and Anil Kumar Chakravarty (1934) ; Binoy Ghosh and Basanta Ghosal (1935) ; Devaprasad Bhattacharya, Santosh Mitra and Miss Bani Roy (1936) ; Devaprasad Chatterjee, Narahari Kaviraj and Miss Bani Roy (1937) ; Santosh Bose and Miss Pratima Banerjee (1938) ; Subrata Sarkar and Miss Nirupama Banerjee (1939) ; Ramkrishna Maitra and Miss Alaka Guha (1940) ; Sanat Ghosal and Miss Lila Maitra (1941) ; Subhendu Banerjee and Miss Kshama Banerjee (1942) ; Samir Basu and Miss Purabi Banerjee (1943) ; No publication-owing to 'Paper Economy' (1944) ; Asim Bhattacharya, Amiya Mukherjee, Jibendra Sinha Roy ; Ramendranath Bose, Miss Kamala Dutt and Miss Indira Bose (1945) ; Editor-in-chief ; Pijuskanti Chatterjee, Arunkumar Dasgupta, Naresh Chandra Ghosh, Suhas Kumar Roy, Ramprasad Chakravarty, Amal Kumar Chakravarty, Miss Samjukta Kar and Miss Srimati Chakravarty (1946) ; Editor-in-chief ; Sobhanlal Mukherjee, Arun Mukherjee Asoke Sengupta, Asoke Chatterjee, Ranjit Ganguly, Sukumar Banerjee and Miss Pushpanjali Sen (1947) ; Editor-in-chief : Tejen Guha Roy, Miss Nilima Bose, Miss Bithi Sen, Sunil Dasgupta, Pratul Bardhan Roy, Prithwish Roy Choudhury, Pranakrishna Bhattacharya and Bireshwar Banerjee (1948) ; Satyen Mukherjee and Miss Jayasree Choudhury (1949) ; Madhusudan Ghosh (1950) ; Arun Kumar Roy (1951) ; Smritibikash Ghosh (1952) ; Dulal Das (1953) ; Gopal Chandra Banerjee (1954) ; Samarendra Sengupta (1955) ; Ashim Sen Gupta (1956) ; Malayasankar Dasgupta (1957) ; Ajay Gupta (1958) ; Tripti Kumar Chatterjee (1959) ; Gopal Bandyopadhyay (1960) ; Sukanta Kumar Ray (1961) ; Barun Kumar Banerjee (1962).

Vivekananda—The Man of Action

Sailendra Nath Sarkar

Among those who carried the spiritual heritage of Sree Ramkrishna and helped to disseminate his doctrines and teachings throughout the world the name of Swami Vivekananda deserves conspicuous mention. His indomitable zeal and untiring efforts to lift the veil of obscurity from the face of our beloved Motherland and to raise her in the estimation of people living far away from the geographical limits of our country are well-known to all. It is a tragedy of unparalleled magnitude that we should have missed such a brilliant luminary before his life's mission could reach its glorious consummation.

Broad-shouldered and tall in stature and having a muscular body with a scintillating flame in his eyes he impressed every body he came across and commanded spontaneous respect and obedience wheresoever he went. At the inaugural meeting of the Parliament of religions in Chicago (1893) this hero and prophet from India held the audience spell-bound by means of his telling and graceful delivery and his deep mellifluous voice. His speech created a stir and sensation throughout America.

It exerted such a magical influence upon the Americans that several of them embraced his discipleship afterwards.

Next Vivekananda visited the countries of Europe. His visits roused a keen interest and enthusiasm among the Europeans. He delivered a series of eloquent speeches in course of which he elaborately dwelt upon and gave lucid exposition of the principles and instructions embodied in the 'Bhagabad Geeta', the 'Vedas' the 'Upanishadas' and other sacred books of the Hindus. Yet we shall fail to understand him truly if we imagine that he was an exact replica of his spiritual master whom he followed with unswerving homage and devotion. For in the physical as well as in the moral sphere there was a striking contrast between the master and his pupil.

While Sree Ramkrishna was completely immersed in the love and worship of the Divine Mother and lost himself entirely in the contemplation of Eternity, Vivekananda gave to the world a message of action, not of contemplation. All around him he witnessed the heart—rending spectacle of human sufferings and this agonised his soul deeply. Before long came to him the realisation that at the root of all these sufferings lay man's inveterate aversion to action. So he resolutely refused to remain contented with a life of passivity and dedicated himself to the service of humanity, because it was his conviction that service to humanity is service to God. Really he is the Bethoven of the East, for like Bethoven he believed that work is the grand panacea of all the ills of life and the main spring of all virtues.

Vivekananda was born to command. He had such grace, dignity and majesty in his appearance and bearing that everybody looked pale and small by his side. Not to speak of others, even the great master himself, speaking of his beloved pupil, admitted ingenuously enough that he was a child beside a great saint. It is not without significance that in the Himalayan region he was addressed as 'Siva' by a traveller who happened to cross his path.

Vivekananda's mind was full of worries and agitations, storms and turmoils. He used to say that his soul would know no peace and tranquillity so long as a single dog of his country lay stretched upon the ground without food and drink. Indeed, life had an austere meaning for him. It was not a bed of roses but a bed of thorns, where man must work out the various problems of existence by means of severe and unrelenting struggle. Once he defined life as 'the tendency of the unfolding and development of a being under circumstances tending to press it down.'

The great Rishi breathed his last only sixteen years after the demise of his master Paramahansa Deva. He lived barely for four decades. But his short life is crowded with achievements. The Ramkrishna Mission he brought into being has been doing immense service to mankind all the world over. The flame of the mighty fire he kindled will never be extinguished. It will be ever burning with a brighter and brighter blaze, consuming to ashes all that is wicked, unholy and sinful in man.

'Chinese Aggression and our Duty'

Debabrata Sarkar

The call has come from our Motherland. It is an urgent call to all her children to wake up from their dull torpor to the gravity of the situation—a situation almost without parallel in the annals of this sacred land of ours. This situation has been created by the unprovoked and unwarranted aggression of the Chinese. Danger has come from a quarter where danger was least apprehended. We could never think for a moment that the Chinese, once believed to be our friends, would violate so want only and savagely the principle of peaceful co-existence and let loose the blood-hounds of war over the length and breadth of the Himalayan region and enact horrible scenes of carnage and massacre.

Yet what was unbelievable has actually happened. We have been shocked and surprised, beyond measure, to find that the Chinese have betrayed us. We were enthusiastically preaching the message of peace and good-will to mankind. The efforts of our venerable Prime Minister to rid this world permanently of the menacing shadows of war are too well-known to deserve mention here. But all we strove for so long has come to nought. Our dream of establishing a sort of world fraternity on the basis of the five principles of 'Panchasila' has been shattered to pieces.

But we know 'There is a soul of goodness in things evil.' The Chinese assault on our freedom and integrity, is fraught with a great blessing for us. It has put an end to all our inter-provincial quarrels and jealousies which where sapping our national strength and vitality. We have to-day risen above all differences and dissensions and become a united nation, strongly and stubbornly determined to fight till we can drive off the last aggressor from our

sacred soil. Thus in adversity we have learnt what we could never do in times of peace and prosperity.

We have achieved our independence after years of unrelenting fight with the mighty British imperialists. We fought with non-violence as our weapon and we won. But what was suitable then is not suitable now. Non-violence proved to be a weapon of marvellous protency in those days in liquidating British imperialism in this country. But the situation is quite different now. We are living in an age when science is dominating the world. Science has placed at the disposal of man some weapons which can effect a quick and sweeping annihilation of humanity. The possession of these destructive weapons has led the nations of the world to deify naked force, though history quite eloquently teaches the truth that naked force, unbalanced by spiritualism, can not survive. To these worshippers of brute force, nonviolence is a very weak weapon. Violence is the only weapon they know and so we must learn as early as possible how to use this weapon in order to beat off the hostile aggression on our land.

If we want there should be no repetition of the vandalism of the Chinese in our Himalayan region, we should be up and doing. We should each have our share in defence preparations. We may or may not be required to take our respective station in the battle-field; still we can serve our country by maintaining internal peace and order, by stopping the mischievous activities of the fifth columnists and fighting corruption in all forms and in a hundred other directions. Youug people might also pour their strength and energy into accelerating the pace of industry and agriculture in the country, That would also be reckoned as service to Mother-land at this juncture.

Annual Report of the Asutosh College

N. C. C. UNIT 1962-63

Capt. K. S. Chatterjee

The year 1962 was a memorable one for the Cadets of the N. C. C. It was at this year's annual training camp that we first heard the news of the massive Chinese aggression along our northern borders. It imposed a great responsibility on the shoulders of the N. C. C. personnel. I am glad to say that our Company Officers along with the other N. C. C. officers lost no time in offering their services to the Government. Our Cadets responded to the call of the Motherland by contributing their mite in the National Defence Fund and they maintained the highest standard of discipline in keeping with the tradition of the Unit.

During the year under review our Company had won a number of trophies at the annual training camp at Chittaranjan. Our Company was adjudged the best in line-dressing and was awarded the most coveted trophy for it. In addition to this our Cadet Sgt. Gouri Sankar Chatterji, got the trophy for the best Battalion Orderly Sergeant and L/Cpl. Ashoke Joshi got the trophy for the best Stick Orderly. The cadet Under-Officer N. Pal, got the trophy for the best marksmanship and the cadet Under-Officer Ashoke Gautam was selected to represent the Battalion at the All-India Shooting Competition. For his meritorious service to the N. C. C. as Cadet Under-Officer, the Principal has been pleased to award him a Blazer. I am glad to say that Under-Officer Gautam has just passed the 'C' Certificate, the highast examination in the N. C. C. Out of four successful candidates in the 'C' Certificate, the N. C. C. boys from our College secured two positions.

In the history of our College, the Passing-Out Ceremony of the graduates was held for the first time on the 15th February 1963 to confer degrees on the graduates of 1962 of our College. The Vice-Chancellor Shri B. Malik, M. A., L. L. B., Barrister-at-Law, who was the Guest-in-Chief, was given a Guard of Honour by a contingent of N. C. C. Cadets of the College on that occasion. It was an impressive drill, highly acclaimed by all the distinguished guests present.

From the coming session 1963-64 N. C. C. training will be made compulsory for all able-bodied young men reading in colleges under the Calcutta University. Our College will have ten Companies of 1800 Cadets. They will all be enrolled in the N. C. C. Rifles. After completing two years' training in the N. C. C. Rifles they will be able to join the other branches of the N. C. C.

In this expansion scheme the authorities of our College, specially the President of the Governing Body of the College and our Principal are taking keen interest to make it a success. Both of them are members of a special Committee appointed by the Senate of the Calcutta University to consider the steps to be taken for making N. C. C. training compulsory in the University Courses.

I shall now hope that our new Cadets of N. C. C. Rifles would maintain the same standard of discipline which has become synonymous with N. C. C. training.

The report of the Geological Association

ASUTOSH COLLEGE

1962

The following members have been elected to the executive committee for the year 1962-63, in the general meeting, held on 16th September, 1962.

President—Prof. S. K. Chatterjee, *Vice-President*—Prof. A. Roy, Prof. A. Ghosh, *Treasurer*—Prof. S. Basumallick, *Asst. Treasurer*—Sri Ajoy Sen, *Genl. Secretary*—Ashoka Mukherjee, *Asst. Secretary*—Arup Mukherjee, Anup Gupta, *Editor*—Dwipen Banerjee, *Sub-Editor*—Prabir Basu, Prasanta Mallick.

Within this short span of time, the following matters were transacted.

Wall magazines are being published regularly twice a month which have earned some appreciations from the students.

Thre is a proposal to hold an exhibition immediately in a larger scale. The date will be announced in due course.

An essay competition was arranged for the students of the department and prizes will be awarded on the opening day of exhibition. The association intends to conduct such competitions from time to time to encourage the study of geological science.

We have proposals to arrange for popular lectures by scientists of standing as well as for Cinema or Magic Lantern shows.

At a farewell meeting given on the eve of the departure of Prof. Susanta Dev for Czekoslovakia for higher studies there, the members of the association duly acknowledged his services for the dept. and wished him happy "Come back". Vice-principal Prof. N. K. Bhattacharjee presided over this happy function and he also spoke very highly of him.

We intend to start a geological magazine in the near future and hope that all the interested persons will make it successful.

ASHOKE MUKHERJEE
General Secretary,
Geological Association

The Vice-Chancellor Sri B. Malik, at the Passing-Out Ceremony of the Graduates (1962) of the Asutosh Group of Colleges.

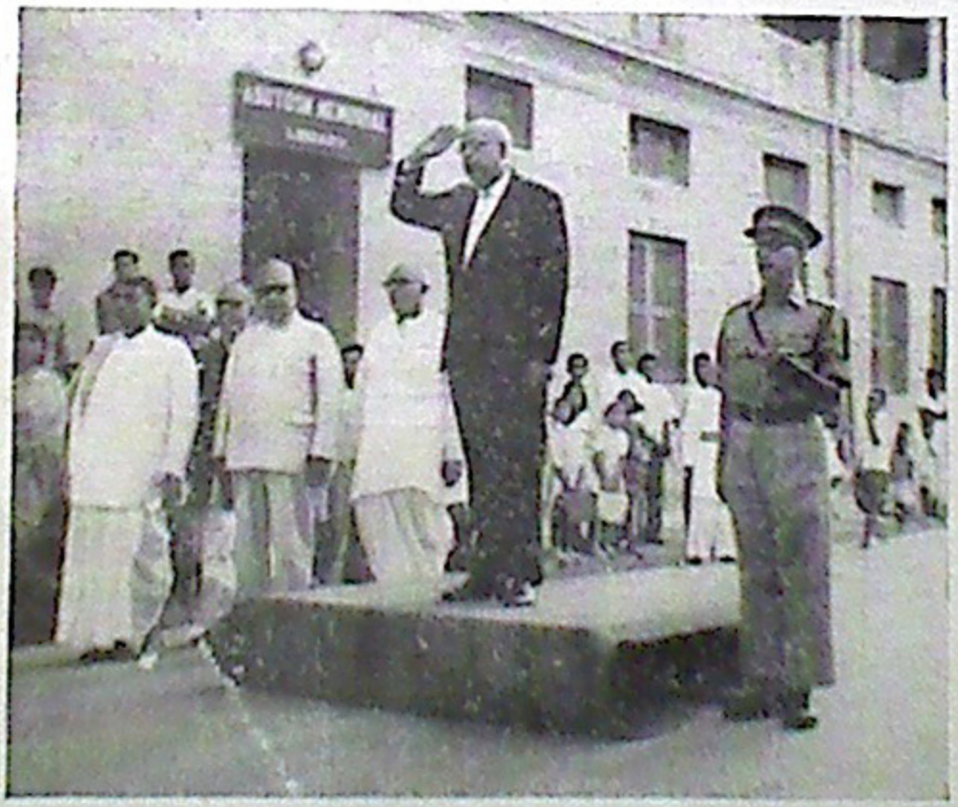

L. to R.—Principal K. N. Sen, Sri R. P. Mukherjee (President), G. B.; S. N. Modak (Treasurer), Sri J. N. Majumdar (Secy.), G. B.; Sri B. Malik (Vice-Chancellor, Capt. K. S. Chatterjee, (In-Charge, N. C. C.), Vice-Principal N. K. Bhattacharya. Taking the salute.

ASUTOSH COLLEGE AMBULANCE DIVISION

THE ST. JOHN AMBULANCE BRIGADE (INDIA)

No. II (West Bengal District, Annual Inspection—1962

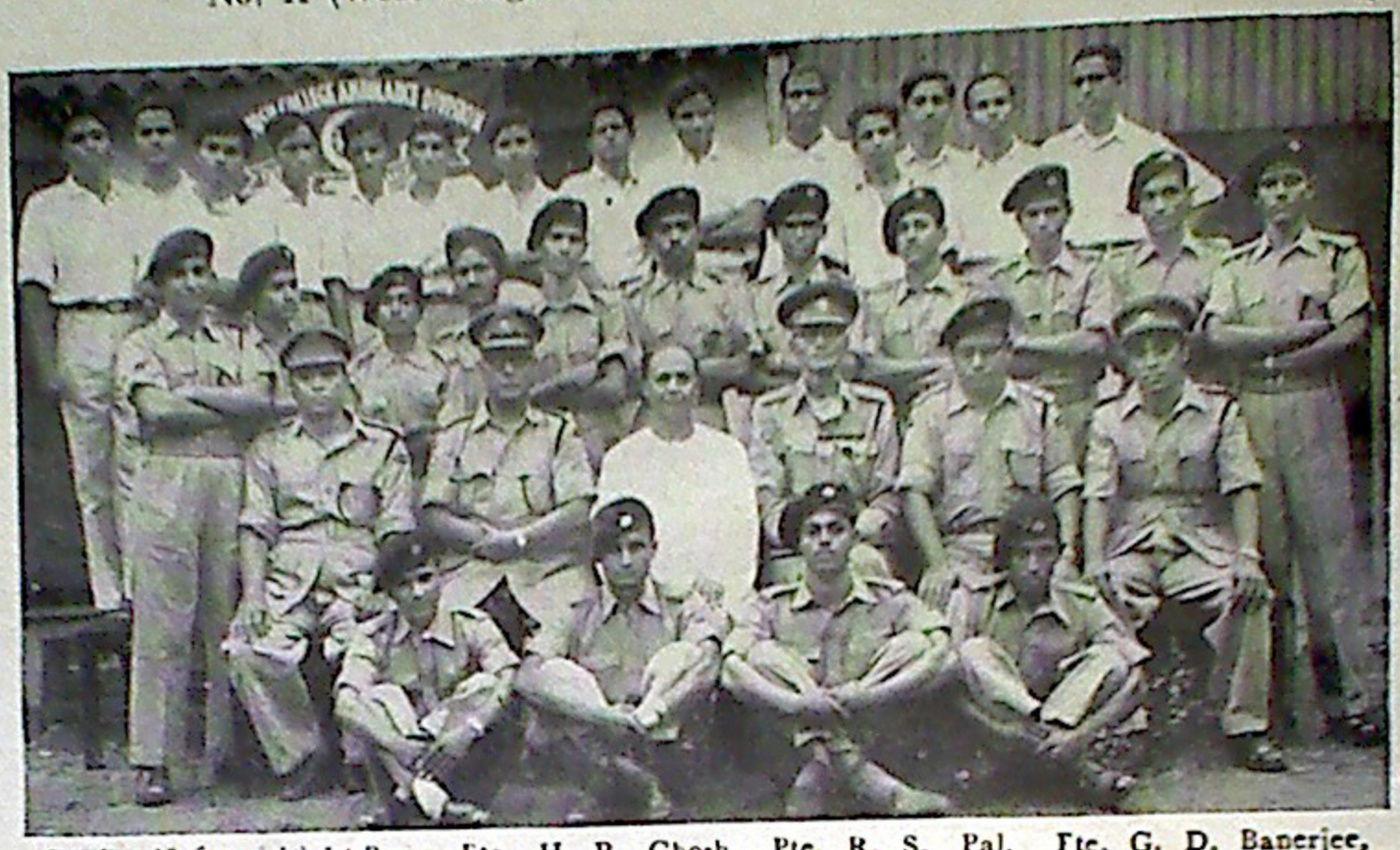

Standing (Left to right) 1st Row :—Pte. H. R. Ghosh, Pte. R. S. Pal, Pte. G. D. Banerjee, Pte. D. Manik, Pte. D. P. Parchi, Pte. G. Sengupta, Pte. H. P. Chatterjee (Jr). Pte. B. Mitra, Pte. D. Banerjee, Pte. N. Halder, Pte. M. K. Ghosh, Pte. S. Chatterjee, Pte. B. M. Jana, Sgt. A. Pal.

Standing (Left to right) 2nd Row :—Sgt. A. Banerjee, Pte. S. Mandal, Pte. S. Dutta, Pte. J. Singh, Pte. S. Debnath, Pte. K. P. Sen, Pte. P. K. Chakravarty, Pte. S. Dutta, Pte. A. Banerjee, Pte. R. Mandal, Cpl. D. Saha.

Sitting (Left to right) on Chair :—Div. Suptt. A. R. Dutta, Staff Officer N. R. Sirkar. Vice-Principal N. K. Bhattacharjee, Dist. Supdt. Dr. P. C. Roy, Amb. Officer P. K. Roy, Div. Surgeon Dr. P. K. Ghosh.

Sitting (Left to right) on ground :—Pte. P. Sinha, Pte. S. Chatterjee Pte. H. P. Chatterjee (Sr) Pte. P. Basu.

STUDENTS IN SPORTS

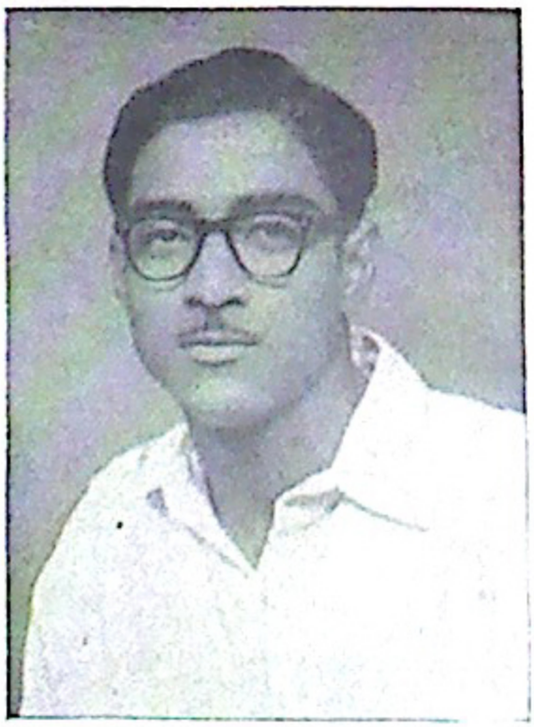

S. Samajpati

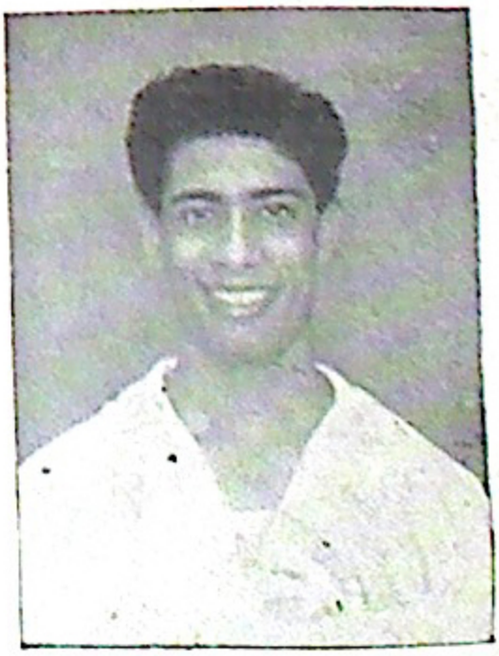

Biswanath Dhali